বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য এবং রবীন্দ্র নাটকের গান

অণিমা রায়

এম.ফিল (দ্বিতীয় পর্ব)

রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪৭৭

সেশন ঃ ২০০৫ - ২০০৬ (পুনঃ)

জুন, ২০১১

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

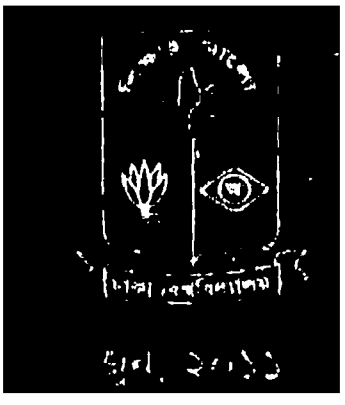

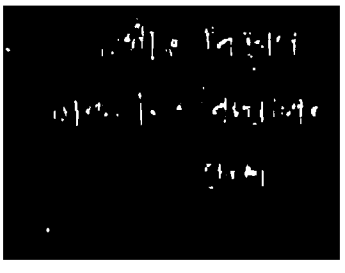

Dhaka University Institutional Repository

467403

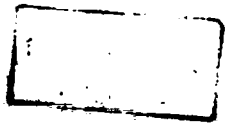

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য
এবং
রবীন্দ্র নাটকের গান

উপস্থাপনা

অণিমা রায়

এম.ফিল (দ্বিতীয় পর্ব)
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪৭৭
সেশন ঃ ২০০৪-২০০৫ (পুনঃ
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

467409

Dhak University Library
467409

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

জুন, ২০১১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য
এবং
রবীন্দ্র নাটকের গান

467403

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

467403

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সত্যায়িত

অণিমা রায় এর এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য 'বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য এবং রবীন্দ্র নাটকের গান' শীর্ষক গবেষণা পত্রটি আমার সূক্ষ্ম পর্যালোচনা, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনে তৈরি হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে এর আগে কোন গবেষক গবেষণা করেন নি। অণিমা রায় নিজের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ও বিভিন্ন গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের সহায়তা নিয়ে নিজ দায়িত্বে এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করেছেন।

তত্ত্বাবধায়ক

তারিখ: ঢাকা
জুন, ২০১১

(ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী)
অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গিকারনামা

আমি অঙ্গিকার করছি যে, 'বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য এবং রবীন্দ্র নাটকের গান' এই বিষয়ে আমার আগে কোন গবেষক গবেষণা করেন নি।

গবেষক

19.06.2011

তারিখঃ ঢাকা
জুন, ২০১১

(অণিমা রায়)
এম. ফিল (দ্বিতীয় পর্ব)
রেজিস্ট্রেশন নং ঃ ৪৭৭
সেশন ঃ ২০০৪-২০০৫ (পুনঃ)
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

'বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য এবং রবীন্দ্র নাটকের গান'- শীর্ষক গবেষণাকার্যে যে বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের অবস্থান, গীতিনাট্যশালার কার্যাবলী, তৎকালীন গানে ব্যবহৃত রাগরাগীনি ও মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে আলোকপাত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য ও নাটকের গান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. রবীন্দ্রনাথ রচিত গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য ও নাটক-সহ সকল রূপক সাংকেতিক নাটকের বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে গান এবং এই গান ব্যবহারের কারণ ও বৈশিষ্ট্যসহ কতিপয় উদাহরণ -এ গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে।

৩. রবীন্দ্র গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্যের পর্যালোচনা-সহ তাদের তুলনা, সুরসমাবেশ, রূপান্তর, কাব্যবস্তু, মঞ্চকলা, রূপসজ্জা, কাহিনীর মূলসূত্র ও তৎকালীন মঞ্চ পরিবেশনার কিছু ছবি সংযুক্তির মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. রবীন্দ্রনাটকের গানের আনুমানিক পরিসংখ্যান, নাটকের গান ব্যবহারের কারণ, ব্যবহৃত গানের বৈশিষ্ট্য, নাট্য সংগীতে সুরের প্রাধান্যতা-সহ কতিপয় নাটকে ব্যবহৃত গানের উদাহরণ আলোচনার সাথে সাথে রূপক সাংকেতিক নাটক সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক- ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীকে। আমাদের বাংলা সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে গাঠনিক রূপ প্রদান করতে যার অবদান অনস্বীকার্য। এ প্রাজ্ঞজন যিনি তার শত ব্যস্ততার ভেতরেও আমাকে প্রয়োজনীয় বই ও তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে গবেষণা কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ন করেছেন, যা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহকর্মীদের বিশেষ করে- রুমা খোন্দকার, খালেদা লুৎফুন্নেছা'কে। যাদের নিয়মিত উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতা এই গবেষণা কাজটিকে সম্পূর্ণ করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। অক্লান্ত শ্রম দিয়ে কম্পোজ ও গ্রাফিক্স-এর কাজটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করায় কৃতজ্ঞতা জানাই রবি হাসানকে। আর যার প্রতি রয়েছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা তিনি হচ্ছেন দৈনিক ইত্তেফাকের বিনোদন সম্পাদক, তানভীর তারেক। যার সার্বিক সহযোগিতার ফলাফল আমার এই পূর্ণাঙ্গ থিসিস **'বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য এবং রবীন্দ্র নাটকের গান'**।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা আমার পরিবার, মা-বাবার প্রতি, যাদের নিরব ও নিবিড় ভালোবাসা আমাকে আরো সামনে এগোতে তাড়া করে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

শিরোনাম সম্বলিত পৃষ্ঠাসমূহ..... I-III

তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সত্যায়িত..... IV

অঙ্গিকারনামা..... V

সারসংক্ষেপ..... VI

কৃতজ্ঞতাস্বীকার..... VII

সূচীপত্র..... VIII-XII

উপস্থাপিত ছবির তালিকা..... XIII

ভূমিকা..... ১-৩

প্রথম অধ্যায় ঃ উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য..... ৪-২৫

উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্যের তালিকা..... ১০-১১

গীতিনাট্যের হালকা পরিহাস ও এর ব্যতিক্রমী উদাহরণ..... ১৬-১৭

বাংলা গীতিনাট্যে ব্যবহৃত রাগ-রাগিনী ও তাল..... ১৮-১৯

কতিপয় গীতিনাট্যশালা ও তাদের কার্যাবলী..... ২০-২১

ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গিতিক আবহাওয়ায় গীতিনাট্য..... ২২-২৪

উনিশ শতকের মঞ্চসজ্জা..... ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ..... ২৬-৬৯

বাল্মিকী প্রতিভার পটভূমি..... ২৯

অপেরার আবির্ভাব..... ৩০-৩২

গীতিনাট্যের গায়ন পদ্ধতি..... ৩৩-৪৬

সুর সমাবেশ..... ৪৭-৫৯

গীতিনাট্য রূপান্তর..... ৬১-৬২

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্যের মঞ্চকলা ও রূপসজ্জা..... ৬৩-৬৫

গীতিনাট্যের কাব্যবস্তু..... ৬৬-৬৭

গীতিনাট্যের প্রকৃতি ও পরিধি..... ৬৮-৬৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলা নৃত্যনাট্য..... ৭০-১০৭

নৃত্যনাট্য উদ্ভবের প্রাচীন কথা ৭৩-৭৮

রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যনাট্যের বৈশিষ্ট্য..... ৮০

রবীন্দ্র নৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যের তুলনা..... ৮০-৮১

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যচর্চা..... ৮২-৮৪

শান্তিনিকেতনে নৃত্য চর্চা শুরু..... ৮৪-৮৮

রবীন্দ্রনৃত্যে বিভিন্ন নৃত্যধারার সমন্বয়..... ৮৮-৯১

বিভিন্ন ঋতুনাট্যে নৃত্যের প্রয়োগ..... ৯১-৯৪

কবির বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় নৃত্য..... ৯৬-৯৮

কতিপয় নৃত্যনাট্যের আলোচনা..... ৯৯-১০৭

চিত্রাঙ্গদা..... ১০০-১০২

শ্যামা..... ১০৩-১০৪

চন্ডালিকা..... ১০৪-১০৫

নটীর পূজা..... ১০৫

শাপমোচন..... ১০৫-১০৭

পোষাক ও সাজসজ্জা ১০৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ নৃত্যনাট্যের পর্যালোচনা..... ১০৮-১২২

নৃত্যনাট্যে গানের আঙ্গিক..... ১১২-১১৪

অনিয়মিত দৃশ্য..... ১১২-১১৩

সংলাপধর্ম..... ১১৩-১১৪

চিত্রধর্ম..... ১১৪

নৃত্যনাট্যের গায়ন পদ্ধতি..... ১১৪-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

সুর সমাবেশ..... ১১৬-১১৭

নৃত্যসমাবেশ..... ১১৮

নৃত্যনাট্যের রূপান্তর..... ১২০

নৃত্যনাট্যের কাব্যবস্তু..... ১২১

নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলা ও রূপসজ্জা..... ১২১-১২২

নৃত্যনাট্য কাহিনীর মূলসূত্র..... ১২২

পঞ্চম অধ্যায় ঃ গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের পার্থক্য আলোচনা..... ১২৩-১২৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাটকের গান..... ১২৮-১৩১

আনুমানিক পরিসংখ্যান..... ১৩০-১৩১

সপ্তম অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাটকের গান ব্যবহারের কারণ..... ১৩২-১৪৪

রবীন্দ্র নাটককে ঐতিহ্যের সাথে যুক্তিকরণ..... ১৩৯

জীবনের নির্যাস হিসেবে রবীন্দ্রনাটকের গান..... ১৪০

নাটকের অন্তর্নিহীত দাবী গান..... ১৪০-১৪১

রবীন্দ্রনাটকের গান চরিত্রের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রকাশ..... ১৪২-১৪৩

নাটকের আবহ রচনায় গান..... ১৪৩-১৪৪

অষ্টম অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাটকে ব্যবহৃত গানের বৈশিষ্ট্য..... ১৪৫-১৫৯

রবীন্দ্রনাটকের গান অনির্বচনিয়তার আভাস..... ১৪৬-১৪৭

পূর্ণাঙ্গ গান দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করে ব্যবহার প্রবণতা..... ১৪৮

নাটকের গানে কোরাসের ব্যবহার..... ১৪৯

রবীন্দ্রনাটকের থীম গান..... ১৫০

রবীন্দ্রনাটকে গান এক গভীর অন্তনাট্য..... ১৫১

রবীন্দ্রনাটকের গান চরিত্রের চাবির কাজ করে..... ১৫২

নাট্যপ্রসঙ্গ বিচ্যুত বিশুদ্ধ গান..... ১৫৩-১৫৪

গান কখনও কথায় পূর্ণ প্রয়াস..... ১৫৫-১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায় ঃ নাট্যসঙ্গীত রচনায় সুরের প্রাধান্যতা..... ১৬০-১৭৬

ভাবই সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর মূল উদ্দেশ্য..... ১৬৫-১৬৭

রাগ-রাগিনীর সাথে বাউল সুরের মিলন..... ১৬৮-১৭১

সঙ্গীত তার গীতত্বের মূল্যেই নাটকে বিশিষ্ট..... ১৭২-১৭৩

কথা ও সুরের যুগল মিলন নাটকের গানে..... ১৭৩-১৭৬

দশম অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাটকে গানের ব্যবহার..... ১৭৭-২০১

ভগ্নহৃদয়..... ১৭৮

নলিনী..... ১৭৯

বাল্মিকীপ্রতিভা..... ১৭৯-১৮০

কালমৃগয়া..... ১৮০

প্রকৃতির প্রতিশোধ..... ১৮১

মায়ার খেলা..... ১৮১-১৮৩

রাজা ও রানী..... ১৮৩

বিসর্জন..... ১৮৪

গোরায় গলদ..... ১৮৪

প্রজাপতির নির্বন্ধ..... ১৮৪

বিনে পয়সার ভোজ..... ১৮৫

শারদোৎসব..... ১৮৫-১৮৬

বৌঠাকুরানীর হাট..... ১৮৬

রাজা..... ১৮৭

অচলায়তন..... ১৮৮-১৮৯

মুক্তধারা..... ১৮৯

ফাল্গুনী..... ১৮৯-১৯১

ঋণশোধ..... ১৯২

বসন্ত..... ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

রক্তকরবী..... ১৯৩-১৯৪

চিরকুমার সভা..... ১৯৪

শোধবোধ..... ১৯৪-১৯৬

শেষ রক্ষা..... ১৯৬

শেষ বর্ষণ..... ১৯৭

পরিত্রাণ..... ১৯৮

তপতী..... ১৯৮

নবীন..... ১৯৮

শাপমোচন..... ১৯৯-২০১

একাদশ অধ্যায় ঃ রবীন্দ্র গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য ও রূপক সাংকেতিক নাটক ২০২-২১১

উপসংহার..... ২১২-২১৪

গ্রন্থপঞ্জি..... ২১৫-২১৭

Dhaka University Institutional Repository

উপস্থাপিত ছবির তালিকা

শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রতিকৃতি	III
২. কবির জন্মবার্ষিকীতে একটি নৃত্যানুষ্ঠান	৯
৩. গীতিনাট্য মায়ার খেলার দৃশ্য	৩৩
৪. কবির শেষ জন্মবার্ষিকীতে নৃত্যানুষ্ঠান	৬০
৫. শ্যামা'র নৃত্যনাট্যের দৃশ্য	৭৯
৬. চন্ডালিকা'র নৃত্যনাট্যের দৃশ্য	৯৫
৭. চন্ডালিকা'র দৃশ্য	১১১
৮. তাসের দেশ-এর দৃশ্য	১১৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীত যে মোহিনী শক্তির অধিকারী সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। তা অবিসংবাদিত সত্য। শিল্পকলা মাত্রই আকর্ষণ শক্তি আছে। বাক্যের কথাবলি অথবা চিত্র, ভাস্কর্য বা নৃত্যই হোক। সৌন্দর্য্যের প্রকাশ রূপে প্রত্যেক শিল্পই আকর্ষণীয়। সুরে, কথায়, ছবিতে, মূর্তিতে ও দেহ বিভঙ্গে মানুষ সৌন্দর্য্য ভাবনার যেসব আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে তা অন্যের চিত্তকে প্রলুব্ধ না করে পারে না। তাই শিল্প মাত্রই মানুষের এত প্রিয়। তবে সঙ্গীতের মাধুর্য্য ভিন্ন স্বাদের, অন্তরকে সঙ্গীত যেভাবে আত্মসাৎ করে তা তুলনাহীন। কোন চিত্র বা মূর্তি মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু সুরের প্রভাব মূর্ত হওয়া কঠিন। কবিতা বা উপন্যাসে নিবিষ্ট চিত্তও বিক্ষিপ্ত হয় গানের সুর যখন কানে আসে। সঙ্গীতের মাহাত্ম এখানেই।

আর মানবমনের অন্তরীণ রহস্যকে রূপ দেওয়াই হচ্ছে অভিনয়ের লক্ষ্য। নানাভাবে আমরা নিজেদের প্রকাশ করে থাকি। অভিনয় দর্পণে সুস্পষ্টভাবে চারটি রীতির কথা বলা হয়েছে। যেমনঃ আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য্য ও সাত্ত্বিক এগুলো সম্মিলিত ভাবেও প্রকাশ করা যায়। বলাবাহুল্য অন্তরের ভাবের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির সাজুজ্য সাধন করা শিল্প। তারই অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে গীতিনাট্যগুলোতে। গানকে মাধ্যম করে অভিনয় করাকে বা গানের ভেতর দিয়ে নাটকের সংলাপ প্রকাশ করার রীতিকেই গীতিনাট্য বলে।

গীতিনাট্য

গানের ভেতর দিয়ে নাট্যবস্তুকে রূপ দেওয়াই গীতিনাট্যের মূল কথা। গীতিনাট্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাটকটি আদ্যান্ত গানে রচিত এবং গেয়ে অভিনয় করা হয়। নাটকের সংলাপ গদ্যে অথবা কখনও ছন্দবদ্ধ পদ্যে রচিত হয়ে থাকে। এর সাধারণ ধর্ম অভিনয়। পার্থক্য হচ্ছে একটি সুরহীন বানী আশ্রয় নেয় অপরটি সুরান্বিত বানীকে আশ্রয় করে। একটি সাধারণ ভাষা অপরটি সুরসমন্বিত ভাষা। নাটকের সংলাপ গদ্যে বা পদ্যে, যেভাবেই রচিত হোক না কেন তার লক্ষ্য মনের ভাবকে প্রকাশ করা এবং সেজন্যেই বলতে পারি সংলাপের মূল হচ্ছে কথা বলার ঢংটি ফুটিয়ে তোলা এবং অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাকে রূপদান করা।

নৃত্যনাট্য

নেপথ্যে গান ও দৃশ্যত নাচের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু পরিস্ফুট করা হয়। শাস্ত্রে উল্লেখিত সঙ্গীত শব্দের অর্থ নৃত্যনাট্যের গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে অভিব্যক্ত হয়। নৃত্যনাট্য মূলত সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় সর্বোপরী মঞ্চসজ্জা এবং নাট্য পরিবেশনার নিপুণ সম্মিলনের এক অপূর্ব পরিণত ফসল। যে নাট্য-বিষয়বস্তুর প্রধান দায়িত্ব নৃত্যের উপর থাকে এবং নৃত্যের প্রয়োজনে সঙ্গীতাংশকে ব্যবহার করা হয় তাকেই নৃত্যনাট্য বলা হয়। এখানে পাত্র-পাত্রীর মুখের গান নেপথ্যে শিল্পীরা পরিবেশন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গানের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নৃত্যকে নাট্যকার্য্যে প্রয়োগ করলেন এবং একে একে রচিত হলো 'চিত্রাঙ্গদা', 'চন্ডালিকা', 'শ্যামা', 'নটীর পূজা', 'শাপমোচন', ইত্যাদি। নৃত্যনাট্যগুলিতে কবি ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলী নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং এখানে নৃত্যেরই প্রাধান্য। যেমন শ্যামা নৃত্যনাট্যে কথাকলি, মণিপুরী এবং কথ্যক নৃত্যশৈলীর এক স্বার্থক সংমিশ্রণ দেখা যায়। নাটকের অন্তর্নিহীত ব্যঞ্জনাকে অধিকতর স্পষ্ট করে অব্যঙ্গ মানুষ গোচর করবার জন্যই কবি গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ভঙ্গিমায় কথা ও দেহছন্দ প্রয়োগ করেন।

রবীন্দ্রনাটকের গান

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম
জগ্রাহ পাঠ্যং ঋগ্বেদাৎ সামেভ্যোগীতমেষ
জজুর্বেদাদভিনয়ান রসানাতর্বনাদপি।
ঋগ্বেদাৎ সামেভ্যোগীতমেষ
নাট্যশাস্ত্রঃ ১। ১৭

চতুর্বেদের বিভিন্ন উপাদান থেকেই নাট্যউপাদান সৃষ্টি। ঋগ্বেদ থেকে সংলাপ, সাম্বেগ থেকে গীত, জর্জুবেদ থেকে অভিনয় এবং অর্থাবদ থেকে রস। এই চারটি উপাদানের সম্মিলনে নাটকের সৃষ্টি। অর্থাৎ গীত যে নাটকের একটি উপাদান তা নাট্যশাস্ত্রগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলা নাটকে জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসেবে গান সর্বদাই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গতিহীন নাটক অর্থাৎ কেবল সংলাপ নির্ভর নাটক শ্রোতা দর্শকের মনে স্থায়ী জায়গা গড়ে তুলতে পারতো না বলেই গানকে বাংলা নাটকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সাধারণত বাংলা নাটকে গানের ব্যবহার হতো বিভিন্ন কারণে যেমনঃ

১. দর্শকদের অতিরিক্ত কিছু আনন্দ দেয়া
২. আবেগময় কোন মুহুর্তকে ঘনীভূত করা ও
৩. নাটকের গল্পের গীতিময়তার একটি সাংকেতিক নির্দেশ দেবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকে সঙ্গীত ব্যবহারের ব্যাপক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ হয়েও প্রচলিত উদ্দেশ্যে নাট্যসঙ্গীত রচনা করেননি। পেশাদারি মঞ্চ বা নিয়মিত ব্যবসায়িক অভিনয় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে দর্শকরুচি বা সস্তা গণ চাহিদার দিকটি রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্যকে কখনও নিয়ন্ত্রণ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্য

গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্রমোত্তরণের মধ্য দিয়ে যে সকল উপাদানগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিল ইউরোপীয় অপেরার আদর্শ অনুসরণে বাংলার সেই গীতিনাট্য উনিশ শতকের শেষদিকে একটি নতুন রূপ পেল: তাকে কেউ বলেছেন নতুন যাত্রা, সখের যাত্রা বা গীতিনাট্য; কেউ বলেছেন গীতাভিনয় বা অপেরা। অনেক সময় ঠাট্টা ক'রে একে 'অপ্পেয়েরা'ও বলা হত। এর পাশাপাশি সমার্থক নাট্যরসক শব্দটিও ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের গীতিপ্রধান নাটকের ধারা অন্যত্রও চোখে পড়ে; যেমন- অসমীয় **'অংকীয়া নাট'**, নেপালে প্রচলিত প্রাচীন গীতিনাট্য, দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট প্রদেশে প্রচলিত এক ধরনের নৃত্যাভিনয় ইত্যাদি।

বস্তুতঃ গীতিনাট্যের চাহিদা বা জনপ্রিয়তা এক সময় অনেক বেশী ছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে থিয়েটারের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় অন্যদিকে পাঁচালী, হাফ্-আখড়াই, কবিগান ইত্যাদি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দর্শকের কাছে রুচিকর ছিল না। নাট্যাভিনয় দেখারও তেমন সুযোগ ছিল না । অভিজাত পরিবারে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিতদের জন্যেই সেগুলি অভিনীত হতো। কাজেই মধ্যপন্থার প্রয়োজন হয়েছিল বলেই নাট্যাভিনয়ের বা গীতিনাট্যের উৎপত্তি। উনিশ শতকের নাটকের ইতিহাস এই দুইভাবে দ্বিধাবিভক্ত ছিল।

গীতিনাট্যের আঙ্গিক সম্বন্ধে প্রথমদিকে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ১২৮৫ সালের ৯ ই মাঘ তারিখে **'সংবাদ প্রভাকর'** এ যে বিবৃতি প্রকাশিত হয় তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

"বিগত শনিবার রজনীতে উক্ত জাতীয় নাট্যশালায় আমরা বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। অধ্যক্ষগণ গীতাভিনয়ে সংসারের এবং তৎসহ সাধারণ দর্শকমন্ডলীর রুচি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা চরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। গত কয় বর্ষ ধরিয়া জাতীয় নাট্যশালায় 'সংস্কৃত যাত্রা',যাহা অপেরা নামে অভিনীত হইয়া আসিয়াছেন, অধ্যক্ষগণ এক্ষণে তৎপরিবর্তে প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শনের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন।"

Dhaka University Institutional Repository

একথা বলা হয়েছে **'কামীনিকুঞ্জ'** এ গীতিনাট্যের অভিনয় সম্বন্ধে। মন্তব্যে বলা হয়েছে, **'... পেশাদার যাত্রার যেমন দুই একটি কথা এবং তৎপরেই গান থাকে, এতদিন সেই প্রণালীর অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতেছিল: অধ্যক্ষসমাজ এক্ষণে ইটালিয়ান অপেরার ন্যায় আদি হইতে অন্ত্য পর্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর-প্রত্যুত্তর, স্বাগত বিলাপযুক্ত প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন।'**

এই গীতিনাট্য রচনা করেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রচনাকাল ১২৮৫। মোট পাঁচটি দৃশ্য, আগাগোড়া গানে রচিত। কোন গদ্যসংলাপ নেই। উদাহরণস্বরূপঃ

খাম্বাজ ।	তাল ফেরতা
ললিতা।	সইলো! আজি সাজাব যতনে ফুলহারে শ্রীরাধারে আর বাঁকা শ্যামধনে।
বিশাখা।	বিকচ কমল ফুলে সাজাব হৃদয় খুলে জুড়ায় জীবন সখী, নেহারি নয়নে।
চিত্রা।	কোমলাঙ্গী শ্রীরাধার সবে না কুসুমভার বিনাসূতে গাঁথি হার পরাব দুজনে।

কাহিনী এই, রাত্রিশেষে সখীদের সঙ্গে ব্যাকুল রাধা কৃষ্ণের আগমন প্রত্যাশায় রত। চন্দ্রাবলীর গৃহ থেকে বিদায় নিয়ে এলে রাধা অভিমানে কৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করলেন। পরে অনুতাপ এবং মিলন।

ইউরোপীয় অপেরার আদর্শে **'কামিনীকুঞ্জ'** কে পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য বলা যায়। কিন্তু তখনো অনেকের মনে ধারণা ছিল, নাটকে গনের প্রাচুর্য থাকলেই তাকে গীতিনাট্য বলা চলে। পূর্বেক্ত মন্তব্যের সঙ্গে তাই এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে-**'বলা বাহুল্য, যে. এরূপ প্রথা বঙ্গীয় নাট্য সমাজে সম্পূর্ণ নূতন।'**

Dhaka University Institutional Repository

১২৮৫ সালের ১১ ই মাঘের অভিনয়ের পর সংবাদ-প্রভাকরের সম্পাদকের কাছে একখানি চিঠি প্রেরিত হয় **'কেনচিৎ দর্শকেন'** তাতে জনৈক দর্শক অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন-

"পরিশেষে এক বিষয় তাঁহাদিগকে একটি সৎপরামর্শ দিতেছি।....যদি 'কামিনীকুঞ্জ' নাট্যরসের মধ্যে প্রত্যেক গীতের অবসর স্থানে বাক্‌চাতুর্য থাকিত, তাহা হইলে সেদিন নাটকাভিনয় সম্বন্ধে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইত। সম্পাদক টীকাতে বলেন, দর্শক মহাশয়ের রুচি ভিন্ন দেখিতেছি। 'গীতের অবসর স্থনে বাকচাতুর্য' থাকিলে তাহাকে প্রকৃত গীতাভিনয় বলা যায় না। তাহা সংস্কৃত যাত্রা মাত্র। নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ বিজ্ঞাপন দেন যে, 'কামিনীকুঞ্জ' ইটালিয়ান অপেরা অনুসারে রচিত, বাস্তবিক তাহাই যথার্থ।"

১৮২২, ১৩ ই জুলাই (৩০শে আষাঢ়, ১২২৯) তারিখেরে **'সমাচার দর্পণ'**,-এ এর আগে বলা হয়েছিল-**'নূতন যাত্রা।....নানাপ্রকার রাগরাগিণী সংযুক্ত গান হয় ও বাদ্যনৃত্য এবং গ্রন্থমত পরস্পর কথোপকথন, এ অতি চমৎকার ব্যপার সৃষ্টি।'**

১৮৫৯ এ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, **'গত বিংশতি বৎসরের মধ্যে কবির হ্রাস পাইয়াছে। তাহার ত্রিংশবৎসরের পূর্ব হইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল।'** এই নূতন যাত্রাকেই বলা হয়েছে গীতাভিনয় বা অপেরা-

'আমরা যে যুগের কথা বলিতেছি, সেই যুগে আবার গীতাভিনয় নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরনের একপ্রকার অভিনয় এ দেশে দেখা দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাদস্তর নাটকেরই মত; তফাতের মধ্যে অভিনয় দৃশ্যপটাদির বালাই ছিল না। নাটকাভিনয় এ দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ স্থাপন সম্ভব ছিল না।'

অনেকেই ভেবেছিলেন যে, অপেরায় পূর্ববর্তী যাত্রার প্রয়োজন মিটবে । অবশ্য তাও শেষে প্রহসনের রুপ নেয় এবং সুরুচিরকর নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে।

সেই শতকের সপ্তম-অষ্টম দশক পর্যন্ত পুরোনো ধারার অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন যাত্রার যেমন উদ্ভব হয়েছিল, তেমনি তারই পাশাপাশি ছিল থিয়েটার। কবিগান যদিও তখন জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছিল, তথাপি নিব শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তার প্রভাব বর্তমান ছিল; গীতিনাট্যের শুরু থেকেই- আঙ্গিকের দিক থেকে ইউরোপীয় আদর্শের অনুসারী হলেও, সেই অশ্লীল রুচি তার মধ্যে বিশেষভাবে ছায়াপাত করে। অন্যদিকে থিয়েটারও পুরোপুরি অগ্রসর হবার পথ পায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

এরই মধ্যে দিয়েই ঊনিশ শতকের গীতিনাট্যের জন্ম। মূলত থিয়েটারের প্রয়োগকলা ও যাত্রার বিষয়বস্তু ছিল গীতিনাট্যের উপজিব্য।

এই গীতিনাট্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হত-

১. যেগুলি আদ্যন্ত গানে বাঁধা

২. যেখানে গানের প্রাচুর্য, কিন্তু সংলাপ গদ্যে অথবা পদ্যে।

বলা বাহূল্য ,এই দুই রীতিকে গীতিনাট্য বলা হলেও, প্রথম ধারাকেই গীতিনাট্যের আখ্যা দেওয়া চলে।

গীতিনাট্যের মধ্যে যুগপৎ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সংগীত, পাশ্চাত্য ঐকতান এবং নৃত্যের একত্র সমাবেশ ছিল। ঘেসেড়ে-ঘেসেড়নী, কলু-ভুলুর হীন কদর্য নৃত্য সৌভগ্যবশত রুচিকর নৃত্যের দিকে ঝুঁকেছিল। এর থেকে একথাই বলা যয়, বাংলা গীতিনাট্য ধীরে ধীরে সংহতির পথে চলতে শুরু করেছিল। পূর্বতন নাট্যগীতির ধারাটি নতুন ভাবে এ যুগের গীতিনাট্যের মধ্যে দানা বাঁধবার সুযোগ পায়।

Dhaka University Institutional Repository

শুভ্র সাহার সৌজন্যে

কবির জন্মবার্ষিকীতে একটি নৃত্যানুষ্ঠান

Dhaka University Institutional Repository

ঊনিশ শতকের বাংলা গীতিনাট্যের তালিকা

ছক ঃ এই গীতিনাট্যের ধারাটির পরিচয় দেবার জন্যে (১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রকাশকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল-

১৮৬৫	শকুন্তলা	অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়
১৮৬৫	রত্নাবলী	হরিমোহন কর্মকার
১৮৬৬	শ্রীবৎস রাজার উপাখ্যান	পূর্ণচন্দ্র শর্মা
১৮৬৭	জানকী বিলাম	হরিমোহন রায়
১৮৬৭	সাবিত্রী সত্যবান	তিনকড়ি ঘোষাল
১৮৬৯	চন্ড কৌশিক	অজ্ঞাতনামা
১৮৭০	মালতীমাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
১৮৭১	মৈথিলীমিলন	ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায়
১৮৭২	ধ্রুবচরিত্র	নিমাইচাঁদ শীল
১৮৭৩	ভারতমাতা	কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
	অক্রুর সংবাদ	হরনাথ মজুমদার
১৮৭৪	সতী কি কলংকিনী	নগেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
	রজত গিরিনন্দিনী	হরচন্দ্র ঘোষ
	ঊষাহরণ	অন্নদা বন্দোপাধ্যায়
১৮৭৫	পারিজাত হরণ	নগেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
	কনকপথ	হরলাল রায়
	মানভিক্ষা	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
	পতিব্রতা	রাজকৃষ্ণ রায়
১৮৭৬	আদর্শ সতী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	প্রণয় কানন	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	আগমনী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	মাল্যপ্রদান	হারাণচন্দ্র ঘোষ

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭৭	আনন্দমিলন	রামতরণ সান্ন্যাল
	আগমনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	অকালবোধন	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
১৮৭৮	কামিনীকুঞ্জ (১২৮৫)	গোপাল মুখোপাধ্যায়
	প্রভাত কমল (১২৮৫)	রামতারণ সান্ন্যাল
	দোললীলা	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	কনকপ্রতিমা	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	অনলে বিজলী	রমকৃষ্ণ রায়
	কৈলাস কুসুম	কুসুম দাসী
১৮৭৯	প্রেম পারিজাত	প্রমথ মিত্র
	কৈলাস কুসুম	নগেন্দ্র ঘোষ
	কনক কানন	বিনোদবিহারী দত্ত
	নিকুঞ্জ কানন	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
	বসন্ত উৎসব	স্বর্ণকুমারী দেবী
১৮৮০	আগমনী	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	অন্সর কানন	অতুলকৃষ্ণ মিত্র
	ঊষাহরণ	রাধানাথ মিত্র
	বসন্তলীলা	কুঞ্জ বসু
	নন্দোৎসব	প্রিয়নাথ রায়
	দানলীলা, প্রমীলার পুরী	নগেন্দ্র ঘোষ
	রামলীলা	রামতারণ সান্ন্যাল
	মানময়ী	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮৮১	শর্মিষ্ঠা	অজ্ঞাতনামা
	কাঞ্চনকুসুম	কুঞ্জ বসু
	মায়াতরু	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
	মোহিনী প্রতিমা	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

	অহল্যা হরণ বাল্মীকি-প্রতিভা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই তালিকা থেকে গীতিনাট্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী যাত্রার মধ্যে দেখা যায়, রামায়ণ-মহাভারত, অথবা পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনের প্রয়াস। অবশ্য সামাজিক কাহিনীও কোথাও কোথাও চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সমসাময়িক কালের নাট্যধারার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে, বিষয়ের বা কাহিনীর দিক থেকে দুয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। নাটকে অবশ্য ঐতিহাসিক কাহিনীও স্থান পেয়েছে। গীতিনাট্যে তার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে অর্থাৎ আঙ্গিকের দিক থেকে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও, উপজীব্য হচ্ছে দেশীয় প্রাচীন কাহিনী-নতুন আধারে পুরানো রস বিতরণ।

উনিশ শতকের গীতিনাট্যের আঙ্গিকগত যে দুটি রীতির কথা বলা হয়েছে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ঃ

ক, সংলাপ অংশে গদ্যে, মাঝে মাঝে গান :

কৃষ্ণ। প্রিয়ে আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে

রুক্মিণী। নাথ তোমার আবার ভয় কি- যাহতে ভয়ের উৎপত্তি, ভয় তার কি করতে পারে বল।

কৃষ্ণ। আমি সে ভয়ের কথা কচ্চি না, এ আর এক রকম

রুক্মিণী। ভয়ের তো কমবেশী শুনেছি, এর যে আবার রকম আছে তা তো জানিনে,- সে যাই হোক তোমার এ কি রকম ভয়।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে এ বড় বিষম ভয়, এ ভয়ের কথা মনে হলে ভয়েরও ভয় জন্মায়।

Dhaka University Institutional Repository

গানের নমুনা :

কেন করো ছলনা
সদা মগন কার ভাবে নাথ বল না।
রুক্মিণী। কেন হে চতুরী
বারবার পাইয়ে ললনা।

(পারিজাত হরণ। ১৮৭৫। নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়)

খ. পিলু বারোঁয়া। ঠুংরী

সীতা। আগে এত ভাবিলে মনে
তবে কি দহিত বিরহদহনে।।
রাম। আগে তা কি জানি মনে, হারাইব তোমা ধনে,
সীতা। তাই বুঝি প্রাণপণে রাখিবে হে যতনে।।
রাম। বিধাতা সাধিলে বাদ, প্রমোদে ঘটে প্রমাদ,
সীতা। তবে মিলনের সাধ, বল করি হে কেমনে।।

(জনকা বিলাপ। হরিমোহন কর্মকর ১২৭৪)

গ. ইমনকল্যাণ। আড়াঠেকা

কেন হে নগর, রায়
বাঁশরিটি ধরে সুমধুর স্বরে
বৃন্দে। ডাকিতেছ শ্রীরাধায়।
কুলের কামিনী, রাধা বিনোদিনী
মরে গুরু গঞ্জনায়।

Dhaka University Institutional Repository

ইমনকল্যাণ

ললিতা। ওহে শ্যাম এ তোমার ব্যাভার কেমন,
রাধা বলে কেন ডাক যখন তখন?

ঝিঁঝিট। কওয়ালি

সখি! কি দোষ আমার
কৃষ্ণ। রাধা নামে সাধা বাঁশি বাজে অনিবার।
সখি সদা মনে করি বাজাব না নাম ধরি
এমন নিলাজ বাঁশি কোথা আছে আর?

ঝিঁঝিট	এমন নিলাজ বাঁশি সজনি, না বাজালে তবু বাজে অমনি! (মানিনী। হরিমোহন রায়)	

এর সঙ্গে তৎকালীন গীতিনাট্যে ব্যবহৃত কিছু গানের নমুনাও উল্লেখযোগ্য :

ক. আক্কুটে সব আগেই খেলে,
রোপএট বেড়াই বাদাড় পানে।
দাঁটার জোরে বাগাই বাগা,
বাঁশির শরে বন হরিণে।
তীর কানটায় মারি হাতী
খোঁচায় ভুঁইস বরা গাঁথি
(ধরি) সাতনালায় পাখ্ গহন বনে।
(হরি অন্বেষণ)

Dhaka University Institutional Repository

খ. মদন পীড়নে দেব সইতেছি যাতনা
ঘুচাও অন্তরে সুখ মম সাধনা।
নানা রঙ্গে অনঙ্গ
দহিছে দেখ অঙ্গ,
করিতেছে আশ ভঙ্গ, সহেনা এ বেদনা।

(প্রভাতকমল)

গ. প্রথম যোগিনী। আমার যেমনি বেণী, তেমনি রবে
চুল ভেজাব না।
দ্বিতীয়। আমি খুব ডুব দেব সই
তোর সলা তো শুনবো না।।
তৃতীয়। আমি জল ছেটাব, ছড়াব
তোদের গায়ে দেব;
প্র-দ্বি। আমরা তবে চলে যাব, জলে নাবো না,
সকলে। আর ভাই সাঁতরে সাঁতরে,
এপারে ওপারে করি আনাগোনা।।

(ব্রজলীলা। ১২৮৯। অমৃতলাল বসু)

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্যের হালকা পরিহাস ও এর ব্যতিক্রমী উদাহরণ

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলির অনুসরণে গীতিনাট্যের সাধারণ চেহারাটি অনুমান করা সম্ভব। প্রথমেই, 'সংবাদ প্রভাকরে'র চিঠির প্রসঙ্গ স্মরণ করে বলছি, গীতিনাট্য সম্বন্ধে রচয়িতারা সুস্পষ্ট সংলাপরীতির অনুসারী। এমনকি গিরিশচন্দ্রের গীতিনাট্যের মধ্যেও তাই দেখি। ভাষার দিক থেকে গদ্যসংলাপ কথ্যরীতির অনুসরণ করছে। তৎকালীন কলকাতার কথ্যভাষাই তার আদর্শ। তা ছাড়া গানের ভাষার মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রাসের, দাশুরায়ের পাঁচালী বা কবিগানের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।

ব্যতিক্রমী উদাহরণসমূহ ঃ

উপরোক্ত ধারারই অন্তর্গত, অথচ স্বতন্ত্র, ১৮৭৯ সালে রচিত স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রচিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' গীতিনাট্যের বিশেষ আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র পিছনে তিনটি প্রভাব বর্তমান:

১. ঠাকুরবাড়ীর সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও গীতিনাট্যের অনুষ্ঠান

২. বিহারীলালের সারদামঙ্গল

৩. ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা : অবশ্য অন্যত্র বলা হয়েছে রাজকুমার রায় রচিত 'নাট্যসম্ভবই' (১৮৭৬) প্রত্যক্ষভাবে এই গীতিনাট্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের **'মানময়ী'** ও স্বর্ণকুমারী দেবীর **'বসন্ত উৎসব'**-এর মধ্যে রীতিমত সৌসাদৃশ্য রয়েছে। 'বসন্ত উৎসব'ই 'মানময়ী' রচনায় প্রেরণা দিয়ে থাকবে। 'বসন্ত উৎসব' গীতিনাট্যে ২টি অঙ্ক; প্রথম অঙ্কে ৩টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ৩টি দৃশ্য। মোট ১২টি চরিত্র। 'মানময়ী'তে- মদন, বসন্ত, উর্বশী ও সখীগণ। দুখানি গীতিনাট্যই আদ্যন্ত গীতিময়। দৃষ্টান্ত:

Dhaka University Institutional Repository

ক. 'বসন্ত উৎসব' থেকে–

উষা। ধরলো ধরলো ডালা, এই নে কামিনীফুল।

ইন্দু। (উষাকে ঈষৎ ঠেলিয়া) তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরাকুল॥

উষা। (কপালে হাত দিয়া আকুলভাবে)

উহু, সখি, মরি জলি

কপালে দংশেছে অলি–।

খ. 'মানময়ী' থেকে–

১ম সখী। ছি ছি সজনী, যায় যায় রজনী-

উর্বশী। যায় যাক্, যায় যাক॥

তোরা মাত্ প্রমোদে সই।

সখীগণ। ছি ছি আজি! ওকি কথা রঙ্গিনি বলো সুখ তরঙ্গে সজনী সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ঢালো।

এই গীতিনাট্যের **'আয় তবে সহচরী'** গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত। এই দুখানি গীতিনাট্যের আঙ্গিকগত সংহতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাহিনীর দিক থেকে প্রচলিত ঐতিহ্যের অনুসরণ করলেও এই দুখানি গীতিনাট্য আদর্শের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে তার ব্যতিক্রম।

সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়, এর পিছনে রয়েছে ঠাকুরবাড়ীর সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গীতিনাট্যে ব্যবহৃত রাগ-রাগিনী ও তাল

প্রতিটি গীতিনাট্যেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ-রাগিনী ব্যবহৃত। রামতারণ সান্যাল প্রমুখ সুরকার বা গীতিকার রাগসঙ্গীতেরই আশ্রয় নিয়েছেন। এইসব গীতিনাট্যের মধ্যে নিম্নোক্ত রাগ-রাগিনীগুলি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত:

১. ইমনকল্যাণ
২. ঝিঁঝিট
৩. পিলু
৪. খাম্বাজ
৫. বারোঁয়া
৬. বাহার
৭. লুম
৮. বিভাষ
৯. যোগিয়া
১০. টোড়ি
১৬. আলাইয়া
১৭. আড়ানা বাহার
১৮. সারং
১৯. পরজ-কালাংড়া
২০. কুকুভ
২১. ললিত
২২. সাহানা
২৩. জয়জয়ন্তী
২৪. মল্লার
২৫. হাম্বীর

Dhaka University Institutional Repository

২৬. পরজবাহার

২৭. মূলতান-খাম্বাজ

এর সঙ্গে নিম্নলিখিত তালগুলিও তখন এসব গীতিনাট্যে প্রচলিত ছিল:

১. ত্রিতাল

২. চৌতাল

৩. কাওয়ালি

৪. আড়াঠেকা

৫. যৎ

৬. মধ্যমান ঠেকা

৭. জলদ মধ্যমান

৮. ঝাঁপতাল

৯. ঢিমে তেতালা

১০. একতালা

১১. খ্যামটা

১৩. ঠুংরী

এত উপাদান থাকা সত্ত্বেও গীতিনাট্যের আবেদন সস্তা রুচিকে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এই কারণেই গীতিনাট্যের সমস্ত উপাদান ও আয়োজন প্রায় ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। উনিশ শতকের বাংলাদেশে সঙ্গীতের যে চর্যা শুরু হয়েছিলো তার পিছনে কতখানি শিল্পচেতনা ছিলো তা বলা কঠিন। তবে আসরে বা বৈঠকে চলতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সে দিন আভিজাত্যের নিদর্শন বলে গণ্য হতো। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই ছিল। সম্ভবতঃ তারই প্রভাব গীতিনাট্যের গানের মধ্যে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ থেকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র রচনাকাল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গীতিনাট্যধারার এটাই ছিল সাধারণ চেহারা।

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় গীতিনাট্যশালা ও তাদের কার্যাবলী

বাংলা নাটকের প্রথম পর্বকে অর্থাৎ ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, সখের নাট্যশালার যুগ বলা হয়েছে। পরবর্তীকালের সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম এই সখের বা ব্যক্তিগত নাট্যশালাকে কেন্দ্র করে। সখের নাট্যশালা হিসেবে প্রখ্যাত যেমন-

১. বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ

২. বেলগাছিয়া নাট্যশালা

৩. পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যশালা– যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

৪. শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটারক্যাল সোসাইটি

৫. জোড়াসাঁকো নাট্যশালা- সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬. বহুবাজার নাট্যশালা

৭. বাগবাজার সুখের নাট্যশালা

সখের নাট্যশালাকে কেন্দ্র করেই যেমন বাংলা নাটকের জন্ম, তেমনি আবার মধুসূদন-দীনবন্ধু-রামনারায়ণের মতো নাট্যকারবৃন্দও আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। এইসব নাট্যশালায় যাঁরা অভিনয় করতেন, তৎকালীন সমাজে সকলেই সুপরিচিত। উনিশ শতকের গীতিনাট্যের পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতারাও স্মরণীয়। কিন্তু এদিক থেকে যে দুটি নাট্যশালা বা যাঁদের কথা মনে পড়ে সর্বাগ্রে, তাঁরা পাথুরিয়াঘাটা নাট্যশালার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং জোড়াসাঁকো নাট্যশালার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে ঠাকুরপরিবারের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। তাছাড়া বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনুশীলন ও চর্চা শুরু হয় ঠাকুরপরিবারেই। জোড়াসাঁকো নাট্যশালাকে লক্ষ্য করে প্রাসঙ্গিকভাবে তাই বলা হয়েছে যে, বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে নাট্যশালার দান বড় কম নয়।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু জোড়াসাঁকো নাট্যশালাই নয়, পাথুরিয়াঘাটা এবং বেলগাছিয়া নাট্যশালার ভূমিকাও স্মরণযোগ্য। এই নাট্যশালায় যতীন্দ্রমোহন গোস্বামী ও কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় হিন্দু-সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। অবশ্য সঙ্গীতে আগেই পরিবর্তন এসেছিলো সখের যাত্রাকে কেন্দ্র করে। ১২৮৯ সালের বঙ্গদর্শনে প্রসঙ্গক্রমে বাইজিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তখনকার বাবু-সমাজ এঁদের পছন্দ করতেন খুব বেশী এবং বাইজিদের কণ্ঠে সস্তা টপ্পা নাকি বাংলার সঙ্গীতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে চলেছিলো। বাবুদের এই রুচিটি যেমন সত্য তেমনি যতীন্দ্রমোহন-শৌরীন্দ্রমোহন-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথাও স্মরণযোগ্য। বলা বাহুল্য, 'বাবু সঙ্গীত'র শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটেছে। বাস্তবিকপক্ষে, জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় যে-সব অনুষ্ঠান হত, তার মধ্যে দিয়েই বাংলার সংস্কৃতি তথা সঙ্গীতের নবযুগের সূত্রপাত।

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরবাড়ীর সাঙ্গিতিক আবহাওয়ায় গীতিনাট্য

ঠাকুরবাড়ীকে ঘিরে সঙ্গীতের বা সংস্কৃতির যে আবহাওয়া রচিত হয়েছিলো, তার সুপরিমিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ আছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো ছবি থেকে এই আবহাওয়ার ইতিহাসটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ক. রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' থেকেই শুরু করা যাক ঃ

১. সন্ধ্যাবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙ্গা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ-মহাভারত শোনাইত।... এহেন সংকটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি দ্রুত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল; কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ কলধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল– অনুপ্রাসের ঝক্‌মকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। [ভৃত্যরাজকতন্ত্র]

২. রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। [নানা বিদ্যার আয়োজন]

৩. গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম। [শ্রীকণ্ঠবাবু]

৪. সেই গীতিগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিলো তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। [পিতৃদেব]

Dhaka University Institutional Repository

খ. 'ছেলেবেলা' থেকে –

১. আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিলো শখের যাত্রার চলন। মিহিগলাওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিলো। আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি।

২. বিলিতি সঙ্গীতের গুণ হচ্ছে তাতে সুর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না।

এদিকে বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে

৩. বৌঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া সুরের গান।

গ. 'ঘরোয়া' থেকে –

১. রোজ জলসা হত বাড়িতে। রবিকাকা গান রচনা করতেন, আমি তখন তাঁর সঙ্গে বসে তাঁর গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এসরাজ বাজাতুম।

২. 'অশ্রুমতী'র এইসব গানে সব মাত ক'রে দিলে। এই গানটায় সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিকাকা, ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। রবিকাকাও কয়েকটা গানে সুর দিয়েছিলেন বোধহয়। বিলেতি সুরে বাংলা গান, এখন মজা লাগে ভাবতে।

ঘ. 'জোড়াসাঁকোর ধারে' থেকে –

১. গান বাজনাও হত। তখনকার দিনে মাইনে-করা গাইয়ে থাকতো বাড়িতে

২. এমনিতরো নাচ দেখেছিলুম সে আরেকবার। কর্ণাট থেকে নাম-করা বাইজি আনিয়েছেন। খুব ওস্তাদ নাচিয়ে মেয়েটি।

৩. তিন পুরুষের সেইসব গানের সুর এসে মেশে আবার নতুন নতুন গানের সঙ্গে, রবিকাকার গানের সঙ্গে, দ্বিজুবাবুর গানের সঙ্গে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' থেকে –

সরোজিনী পত্রাশের পর হইতেই আমরা রবিকে প্রমোশান দিয়া আমাদের সমশ্রেণীতে উঠাইয়া লইলাম।... সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহারে সুরসংযোগ করাইয়া প্রচলিত রীতি; কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিলো উল্টা সুরের অনুরূপ গান তৈরি হইতো।

চ. সরলাদেবীর 'জীবনের ঝরাপাতা' থেকে –

১. রবীন্দ্রনাথের জন্যে বাড়িতে ভূমি তৈরি। তিনি এসে তাতে নতুন নতুন বীজক্ষেপ করতে লাগলেন।

২. রবিমামা বিলেত থেকে ফেরার পর তিনি নেতা হলেন দাদাদের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করা ওস্তাদদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুর ভাঙ্গা, নিজের মৌলিক ধারার সুর তখন থেকেই তৈরি করা ও শেখান– এ সবের কর্তা হলেন রবিমামা।

৩. জীবনের প্রথম দিকে কাব্য বা সঙ্গীতের রসগ্রাহিতায় রবীন্দ্রনাথের আত্মপর বিচার ছিলো না। যে কবির যেটি ভালো লাগতো সেটিতে নিজের সুর বসিয়ে গেয়ে ও গাইয়ে তার প্রচার করতেন।

ছ. 'রবিন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণী সঙ্গম'-এ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী বলেছেন –

কবি প্রথম জীবনে বিলেত প্রবাসে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রথম দিককার গানে বা গীতিনাট্যে বিলেতি প্রভাব লক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের মঞ্চ সজ্জা

অষ্টাদশ শতকের যাত্রা বা পালাগানের যুগ চলে গিয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে যেমন নাটক বা অপেরার যুগ দেখা দিলো, মঞ্চকলাও তেমনি পাশ্চাত্য রীতিরই অনুসরণ করছিল। ইউরোপীয় অপেরা হয়তো অনেকেই ভালো চোখে দেখতে পারেন নি, কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপীয় মঞ্চকলার যা কিছু বিকাশ বা উৎকর্ষ তা অপেরাকেই কেন্দ্র করে। সপ্তদশ শতকে মঞ্চের যেসব কারুশিল্পী দেখা দিলেন, সকলেই অপেরার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে জাপানে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চকলার এক যুগান্তর এল, এরই অনুসরণে ইউরোপে karl Lantenchlager ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ম্যুনিকে Residenz Theatre- এ সর্বপ্রথম এই রীতির প্রবর্তন করেন এবং এর পর থেকেই বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই মঞ্চকলায় চূড়ান্তভাবে বাস্তবতা আনবার চেষ্টা চলতে থাকে। উনিশ শতকের বাংলা নাট্যাভিনয়ে তথা মঞ্চকলায় তারই অন্ধ অনুকরণ দেখা যায়। বাংলার সমাজ তখন দ্বিধাবিভক্ত। নব্য ও প্রাচীন-পন্থীরা নিজের নিজের আদর্শকেই প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসী। নব্য ধনী তথা অভিজাত সমাজ পুরোমাত্রায় পাশ্চাত্যভাব বজায় রাখতে ব্যস্ত। তাঁর নাট্যাভিনয়ও ছিলো তারই অঙ্গ, আভিজাত্যের বা বিলাসের অভিব্যাক্তি। নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যেত সকলের সামনে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নবীন বসুর বাড়ীতে 'বিদ্যাসুন্দরে'র যে অভিনয় হয় তাতে দেখি নাট্যাভিনয়কে 'বাস্তব' করে তোলার জন্যে যে বিচিত্র মঞ্চকলার ব্যবস্থা হয় তা 'ছেলেমানুষি' তো বটেই হাস্যকরও বলা চলে। এক অন্ধ অনুসরণজাত কৃত্রিম বাস্তবতার মোহ তৎকালীন মঞ্চকলাকে পঙ্গু করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য থিয়েটারের দৃশ্যপটের অনুকরণের প্রবণতা এমনি মজ্জাগত হয়ে পড়েছিল যে এই দৃশ্যপট তৈরির জন্যে একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। 'সীন' তৈরি করাই ছিল তাঁদের ব্যবসা। তাঁদের বলা হত 'পটুয়া'। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মঞ্চে এঁদের রীতিমতো চাহিদা ছিল। এইসব পটুয়ার রাজপথের ধারেই এইসব 'সীন' আঁকতেন। রাস্তার দুপাশের বাড়ীর দেওয়ালে পট টাঙ্গিয়ে তাঁরা তুলির স্পর্শে রাজপ্রাসাদ, রাস্তার, নদনদী, নগরের রাজপথ প্রভৃতি ফুটিয়ে তুলতেন। অবনীন্দ্রনাথ এমনই এক পাবলিক স্টেজের বর্ণনা দিয়েছেন **'ঘরোয়া'তে 'বসে আছি, ড্রপসীন পড়ল তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা, রাজপুতুর চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ, পিছনে পাহাড়ের সর গ্রীক যুদ্ধের একটা কাণ্ড। কোনো সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়েছিল বোধ হয়,...'** ইত্যাদি বিস্ময়ের কথা, সেদিনকার বিদগ্ধ নাট্য রসিকরাও এই অনুকরণের বা কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নেই ছিলো সঙ্গীতের আশীর্বাদ। তাঁদের অভিজাত পরিবারে একদিকে যেমন হিন্দুস্তানী রাগসঙ্গীতের চর্চা ছিল, তারই পাশে বাংলার দেশী সঙ্গীতেরও স্থান ছিলো। কিশোরী চাটুজ্যের বিবরণ থেকে জানা যায়, দাশুরায়ের পাঁচালীর শব্দঝঙ্কার কবিকে কতখানি মুগ্ধ করেছিল। অন্যদিকে রামায়ণ- মহাভারত প্রভৃতি তৎকালীন সাহিত্য সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছিলো। সেই কারনেই বিদেশী সাহিত্যরসিক হয়েও যুদঘর্মকে অস্বীকার করতে পারেন নি। এরই সঙ্গে, ঠাকুর-পরিবারে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাঁর দিকটিও অনুধাবনযোগ্য। ইতিমধ্যে ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দের সময় বিদেশী ইতালীয় অপেরা কলকাতায় অভিনয় করেন। পুরানো গীতিনাট্যের (নাট্যগীতি ও যাত্রা) আদর্শ তো ছিলই, সেই সঙ্গে বিদেশী অপেরার আদর্শও দেখা গেল। শিক্ষিত-অভিজাত সমাজের দৃষ্টি গেল সেদিকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের **'সরোজিনী'** নাটক অভিনীত হলে দেখা গেল তাতে দু'খানা গান ইংরেজি সুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথও ইউরোপীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নিতান্ত পিছিয়ে ছিলেন না। প্রসঙ্গক্রমে ইন্দিরাদেবীর কথা উল্লেখ করে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ পাঁচটি ইংরেজি গানের তালিকা দিয়েছেন। অতএব, দেখা যাচ্ছে স্পষ্টতই ঠাকুর-পরিবারে রাগসঙ্গীত, দেশী সঙ্গীত এবং ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চার ক্ষেত্র প্রশস্ত ছিল। এর প্রথম দুটি প্রাচীন ঐতিহ্য, তৃতীয়টি নবীন। প্রাচীন ও নবীনের সাযুজ্যই উনিশ শতকের সাহিত্য সঙ্গীতের মূল কথা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সতেরো বছর বয়সে প্রথম বিলেত যান। যাত্রার তারিখ ছিল ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ (৫ আশ্বিন ১৮৮৫)। ব্রাউটনে থাকতে কবি ইউরোপীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই প্রবাসজীবনে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীত শোনবার ও শেখবার চেষ্টা করেন। ১২৮৬ সালের মাঘ মাসের (ফেব্রুয়ারি ১৮৮০) মাঝমাঝি তিনি ফিরে এলেন কলকতায়। যেজন্য বিলেত গিয়েছিলেন, তা হলো না। কিন্তু এই প্রবাসজীবন নানাদিক থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য; বিশেষভাবে সঙ্গীতের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়ে লেখা চিঠিপত্র থেকে কবির সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার কথা স্মরণযোগ্য:

১. আমরা যেদিন ফ্যান্সি-বলে অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলাম– কত মেয়ে-পুরুষ নানারকম সেজে গুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিলো... [৩ সংখ্যক পত্র]

২. গত মঙ্গলবারে আমরা এক ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম... [৩ সংখ্যক পত্র]

৩. যা হ'ক এই পরিবারে সুখে আছি। সন্ধ্যেবেলা আমোদে কেটে যায়। গান বাজনা, বই পড়া। [৩ সংখ্যক পত্র]

একই সঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'র 'বিলাতি সঙ্গীতে'র কিছুটা অংশ মিলিয়ে দেখা চলে ঃ

১. ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিখিতে শিখিতে ইউরোপীয় সঙ্গীতের রস পাইতে লাগিলাম।... ইউরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেনো ভিন্ন...

২. দেশে ফিরিয়া আসিয়া এইসকল এবং অন্যান্য বিলেতি গান স্বজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইলো কেন, কেমন যেন বিদেশী রকমের, মজার রকমের হইয়াছে। এমনকি তাঁহারা বলিতেন, আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন সুর বদল হইয়া গিয়াছে।

অর্থাৎ, প্রবাস-জীবনে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপীয় সঙ্গীতের যে অভিজ্ঞতা, তাতে দেখা গেল- তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার বিলাত-প্রবাসে এ অভিজ্ঞতা আরো গভীরতা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাল্মীকিপ্রতিভার পটভূমি

দেশে প্রত্যাগমনের পর ইউরোপীয় সঙ্গীতের সুরে গান রচনার চেষ্টা করাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। ইতিপূর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের **'মানময়ী'** রচিত ও অভিনীত হয় বিদ্বজ্জনসমাগম উপলক্ষ্যে। এরই কিছু আগে **'বসন্ত উৎসব'** গীতিনাট্যও অভিনীত হয়েছিলো। এই সময়েই এই দেশী ও বিলাতি সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। পরের বছর **'কালমৃগয়া'**। এরও পরে **'মায়ার খেলা'**র। প্রথম গীতিনাট্যের মধ্যে যে কী অপরিসীম আনন্দ রূপায়িত হয়ে উঠেছে তা বোঝা যায় সহজেই– **"বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই।"**

এই দুটি গ্রন্থে সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পায়। অবশ্য, এই গীতিনাট্যের পিছনে প্রত্যক্ষভাবে অন্য কোন গীতিনাট্যের প্রভাব আছে কিনা বলা কঠিন। তবে একটা কথা বলা চলে যে, তিনি নিঃসন্দেহে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের কাছে ঋণী। বিহারীলালের প্রভাব কবি নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। সর্বোপরি, সবগুলি গান রবীন্দ্রনাথেরই সুরারোপ কিনা, তাও সঠিকভাবে বলা তর্কাতীত নয়। এ ক্ষেত্রেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে হাত ছিলো, তার প্রমাণ রয়েছে। এখানে শুধু একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাংলা গীতিনাট্য যা নীহারিকা রূপে প্রাচীন ও মধ্যযুগে নানাভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়েছিলো, তা অবশেষে একটি প্রান্তভূমিতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য অপেরার সঙ্গে পরিচয় ঘটার ফলে পূর্ববর্তী নাট্যগীতের ধারাই অবশেষে নাগরিক পরিবেশে গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হলো। এর পিছনে নব্য নাটক বা থিয়েটারের প্রভাবও স্বীকার করা হয়েছে।

ইউরোপে **'অপেরার'** ভাগ্যে প্রশংসা ও নিন্দা দুইই জুটেছিল। ইংল্যান্ডে অনেক সঙ্গীতবিদদের অভিমত ছিল যে, অপেরা সঙ্গীতকে কোনোরকম প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ অপেরা শিল্পী নাকি অনৈতিক জীবনযাপন করতেন। সর্বোপরি, অপেরা ছিলো মূলতঃ অভিজাতদের বিলাস ও উপভোগের বস্তু। Beethoven এবং Wagner- এর সময় থেকে অবশ্য

Dhaka University Institutional Repository

এ ধারণা বদলাতে থাকে যেদিন থেকে তাঁরা অপেরার ইউরোপীয় সঙ্গীতের একটি উচ্চ আদর্শ ও মান প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যদিকে, অপেরা ইউরোপে এত বেশী জনপ্রিয় যে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট নিদর্শন বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

অপেরার আবির্ভাব

ষোড়শ শতকের শেষ পর্বে ফ্লোরেন্সে কয়েকজন সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিকের চেষ্টায় ও উৎসাহে সর্বপ্রথম অপেরার বীজ রোপিত হয়। এর জন্মসূত্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, প্রাচীন গ্রীক-ট্রাজেডীর মধ্যে তার গোড়াপত্তন, সঙ্গীত ছিলো তার অপরিহার্য উপাদান। দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন কাল থেকেই নাটকে সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ও উপযোগিতা রয়েছে; তথাপি ষোড়শ শতকের শেষে অপেরার (প্রচলিত অর্থে) সূত্রপাত। Daphne ও Apollo-র কাহিনীকে কেন্দ্র করে Ottavio Rinuccini কথা অংশ এবং মুখ্যত Jacopo Peri সুর যোজনা করলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তাঁরা দুজনে Euridice নামে একটি অপেরা রচনা করলেন । সম্ভবত এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ অপেরা। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভ্রান্তে দুটি ধারার জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়- ক. Classical Tragedy, খ. Ballet. এই ব্যালেকে কেন্দ্র করেই ফ্রান্সে অপেরার জন্ম। Jean Baplise Lully (১৬৩২-১৬৮৭) যে রীতিতে অপেরা রচনা করলেন, তার সঙ্গে ইতালীয় অপেরার প্রভেদ দেখা গেল। তিনি নাটকীয় উপাদানের দিকে যেমন বেশী দৃষ্টি দিলেন, তেমনি যন্ত্রসঙ্গীতের প্রাধান্য ও দীর্ঘ গানের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গানের ব্যবহার করলেন। তার সঙ্গে ব্যালের আদর্শও স্থান পেল, যেমন দৃশ্যসজ্জার ঘনঘটা। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই জার্মান অপেরার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা গেলো। তার আগে সুদীর্ঘ এক শতাব্দীকাল মুখ্যত ইতালীয় রচয়িতারাই জার্মান ভাষায় অপেরা রচনা করতেন। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, জার্মান অপেরার সঙ্গে ইতালীয় অপেরার ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশী। এই পর্বের স্মরণীয় জার্মান রচয়িতা হচ্ছেন Reinhard Keiser (১৬৭৪-১৭৩৯)। ইংল্যান্ডে অপেরার জন্ম 'msque' থেকে এবং The Venus and Adonis (১৬৮৫) John Blow রচিত প্রথম ইংরেজি অপেরা। এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচয়িতা হচ্ছেন Henry Purcell (১৬৫৯-১৬৯৫); তাঁর Dido and Aneas (১৬৮৯) আজও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইংল্যান্ডে ষোড়শ শতকের শেষে যন্ত্রসঙ্গীতের জগতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এলো- 'music for music's sake', 'abstract music.' ইংল্যান্ডে ইতালীয় অপেরা

Dhaka University Institutional Repository

কালক্রমে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। Retrortion যুগের 'Recitative Musick'- এর চর্চা তো ছিলোই, তার সঙ্গে ফরাসী অপেরার নৃত্যাদর্শ ও যন্ত্রসঙ্গীত, সবশেষে ইতালীয় আদর্শ– এসবের সমন্বয়ে ইংল্যান্ডে অপেরার আদর্শ গড়ে উঠতে থাকে; তবু এর সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন হয় নি। সোভিয়েট রাশিয়া প্রধানতঃ ইতালীয় অপেরার আদর্শ বজায় রেখেছিলো। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Cherubini-এর অনুসরণে Glinka 'A Life for the Tear' নামে একটি (Rescue Opera) অপেরা রচনা করেন, যার ভিত্তি রুশসঙ্গীতের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পর্বের রুশীয় রচয়িতাদের মধ্যে Moussorgsky (১৮৩৯-১৮৮১) বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, যিনি তাঁর রচনার মধ্যে রুশ-সঙ্গীতের আদর্শ বজায় রেখেছেন। ইউরোপীয় অপেরার ইতিহাস সত্যই বিচিত্র, এবং তা সংক্ষেপে আলোচনার বস্তু নয়। Wagner তাঁর সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় অপেরা বিভিন্ন পরীক্ষার সীমান্ত অতিক্রম করেছে। কখনো কথার সঙ্গে নামমাত্র সুর, কখনো যন্ত্রসঙ্গীতের প্রাধান্য, কোথাও গায়কের কণ্ঠসঙ্গীতের প্রাধান্য, কোথ ও বা এরই সঙ্গে নৃত্যও স্থান পেয়েছে। হালকা রসের অপেরার পাশাপাশি রোমান্টিক অপেরার যেমন আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও অপেরা ক্রমশ বাস্তবের দিকে ঝুঁকেছে। আবার, এই অপেরাকে কেন্দ্র করেই ইউরোপীয় কথাশিল্পের যুগান্তর এসেছে। কাজেই, ইউরোপে অপেরার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ইউরোপীয় অপেরার এই জনপ্রিয়তা এবং তার ঐশ্বর্যই নিঃসন্দেহে উনিশ শতকের বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চকে স্পর্শ করেছে। অর্থব্যয়ে তখন কয়েকটি ইতালীয় অপেরা অভিনীত হয়েছিল যা জানা যায়। অপেরার বাইরের জৌলুসই তৎকালিন দর্শকদের আকৃষ্ট করেছিলো, সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের মনে এসব স্মৃতি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলো, তা বলা কঠিন। বোধ হয় ইউরোপ-প্রবাসেই তিনি এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন তাঁর নিজের লেখা থেকে এই কথাই ধারণা করা যায়। পরবর্তীকালে ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে আর্থার সুলিভাসের গন্ডোলিয়ন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তাতে অপেরা সম্বন্ধে তাঁর কী মনোভাব ছিল তা অনুভব করা যায়। এই পর্বটি তখন ইংল্যান্ডে সঙ্গীতের দিক থেকে নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এর কিছুকাল আগে ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে Wagner ইংল্যান্ডে উপস্থিত হন, তাঁর অপেরার অভিনয়ে লন্ডনে তখন থেকেই অপেরার বা সঙ্গীতের নবজাগরণ শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম ইংল্যান্ডে যান, (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮-ফেব্রুয়ারি ১৮৮০)। অনুমান করা যায়, যে নব-কল্লোল সৃষ্টি হয়েছিলো তৎকালীন লন্ডনে সাঙ্গীতিক জগতে, তিনিও তার রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত হন নি।

Dhaka University Institutional Repository

অপেরাকে তার নিজস্ব পরিবেশে কাছে থেকে দেখার এই সুযোগকেই তিনি বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে ব্যবহার করেছিলেন।

এই কথাগুলি স্মরণ করেই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, বাংলা গীতিনাট্যের ধারাটি বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে শেষ পর্যন্ত সংহতি লাভ করেছে। কবি নিজেও এই গীতিনাট্যটিকে বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে দেখতেন এবং নানা উপলক্ষ্যে এটি বহুবার অভিনীত হয়েছে। বস্তুতঃ বাল্মীকি-প্রতিভা স্বতন্ত্র বা পারম্পর্যহীন বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি নয়, বরং পূর্বাপরতাসূত্রে এর ঐতিহাসিক ভূমিকাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ার খেলার একটি দৃশ্য

[শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে]

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্যের গায়ন পদ্ধতি

গীতিনাট্যের প্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নাটকটি আদ্যন্ত গানে রচিত এবং গেয়ে অভিনয় করা হয়। গানের ভিতর দিয়ে নাট্যবস্তুকে রূপ দেওয়াই হচ্ছে গীতিনাট্যের মূল কথা। নাটকের সংলাপ গদ্যে অথবা কখনো ছন্দোবদ্ধ পদ্যে (কবিতায়) রচিত হয়ে থাকে। দুইয়েরই সাধারণ ধর্ম অভিনয়। পার্থক্য হচ্ছে একটি সুরহীন বাণীর আশ্রয় নেয়, অপরটি সুরান্বিত বাণীকে আশ্রয় করে একটি সাধারণ ভাষা, অপরটি সুরসমন্বিত ভাষা। নাটকের সংলাপ গদ্যে অথবা পদ্যে, যেভাবেই রচিত হোক না কেন, তার লক্ষ্য মনের ভাবকে প্রকাশ করা এবং সেইজন্যেই বলতে পারি, সংলাপের মূল্য উদ্দেশ্য হচ্ছে বাকরীতি বা কথাবলার ঢংটি ফুটিয়ে তোলা; এই অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তাকে রূপদান করতে হয়। মানবমনের অন্তরীণ রহস্যকে রূপ দেওয়াই হচ্ছে অভিনয়ের লক্ষ্য। নানাভাবে আমরা নিজেদের প্রকাশ করে থাকি। গীতিনাট্যে সংলাপের ভূমিকা নেয় সঙ্গীত। সাধারণ অভিনয়ের সব রীতিই তার মধ্যে বজায় রাখতে হয়, শুধু নাট্যবিষয়টি গানের (বা সুরের) মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়।

গীতিনাট্য রচনা করতে গিয়ে সঙ্গীতকে কিভাবে গীতিনাট্যের কাজে লাগিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ তা নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। হার্বার্ট স্পেনসরের মতবাদ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন **'ভাবিয়াছিলাম এই মত-অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন।'** অতঃপর তিনি কথকতার প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং অনতিপরেই মূল কথাটি বললেন– **'ছন্দ হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ– ইহাতে তালের কড়াকড় বাঁধন নাই, একটা লয়ের মাত্রা আছে– ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করিয়া তোলা, কোনো রাগিনী বা তালকে বিশুদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা নহে।'**

ভাবাবেগকে পরিস্ফুট করে তুলতে সঙ্গীতের ক্ষমতা কতখানি বা গীতিনাট্যের অভিনয়ের লক্ষ্য কী, নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে যে, আমরা যখন রোদন

Dhaka University Institutional Repository

করি তখন দুটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে অতি অল্প ব্যবধান থাকে এবং স্বরগুলি কোমল সুরের উপর দিয়ে গড়িয়ে যায়, সুর বিলম্বিত হয়ে ওঠে। তার বিপরীত হাসি। হাসিতে কোমল সুর লাগে না তো বটেই, উপরন্তু তালে রীতিমতো ঝোঁক লাগে। দ্রুত তাল হচ্ছে সুখের ভাব প্রকাশের অঙ্গ। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালেও পরিবর্তন ঘটে। এরই সূত্র ধরে গীতিনাট্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম উল্লেখযোগ্য। তাঁর অভিমত এই যে, গীতিনাট্য আগাগোড়া সুরে অভিনয় করতে হয় বলে স্থানবিশেষ তাল থাকা দরকার। তা না হলে অভিনয়ের স্ফূর্তি বা পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নয়।

এদিক থেকেই গীতিনাট্যের গায়কী বা গায়ন-পদ্ধতির আলোচনা বিধেয়। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি এই রীতিরই অনুসারী। উনিশ শতকের অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্যগুলি কিভাবে পরিবেশন করা হতো, তার আলোকপাত অন্যত্র করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলি তার ব্যতিক্রম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো, অভিনয়ের উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ শিল্পীর বা পরিচালকের দক্ষতার তারতম্যের উপর নির্ভরশীল; স্বভাবতই যা প্রত্যক্ষভাবে অভিনয়ের ব্যাপার। লিখিতরূপে তার সম্পূর্ণ প্রকাশ সম্ভব নয়।

নিম্নে কতিপয় গীতিনাট্যের গায়ন পদ্ধতির পর্যালোচনা করা হলো।

বাল্মীকিপ্রতিভা

বল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের গায়কীর মূল কথা হচ্ছে গানগুলি যেহেতু অভিনয়ের ঢঙে গাইতে হয়, সেজন্যই সাধারণ গায়ন পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটে অর্থাৎ গানগুলি বিনাতালে কিংবা ভাঙ্গা তালে গাওয়া যায়।

গীতিনাট্যের গানগুলিও অনুরূপভাবে পরিবেশন করতে হয়। এই গীতিনাট্যের গানগুলি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:

Dhaka University Institutional Repository

ক. প্রথম দৃশ্য

১. সহে না সহে না কাঁদে পরাণ
২. আঃ বেঁচেছি এখন
৩. আজকে তবে মিলে সবে
৪. এখন করব কী বল
৫. শোন্ তোরা তবে শোন
৬. ওই মেঘ করে বুঝি গগনে
৭. এ কী ঘোর বন
৮. পথ ভুলেছিস সত্যি বটে

দ্বিতীয় দৃশ্য

১. রাঙ্গাপদপদ্মযুগে প্রণমি গো
২. দেখো হো ঠাকুর
৩. নিয়ে আয় কৃপাণ
৪. কী দোষে বাঁধিলে আমায়
৫. এ কেমন হলো আমার
৬. আরে, কী এত ভাবনা
৭. শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ

তৃতীয় দৃশ্য

১. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
২. ছাড়বা না ভাই, ছাড়ব না ভাই
৩. রাজা মহারাজা কে জানে
৪. আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা
৫. আঃ কাজ কী গোলমালে
৬. হা, কী দশা হলো আমার
৭. অহো! এ স্পর্ধা একি তোদের
৮. আয় মা আমার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ দৃশ্য

১. কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই

২. কেন রাজা ডাকিস কেন

৩. চল্ চল্ ভাই ত্বরা করে যাই

৪. প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে

৫. বলব কী আর বলব খুড়ো

৬. সর্দার মশায় দেরি না সয়

৭. রাখ্ রাখ্ ফেল ধনু

৮. তোর দশা রাজা ভালো তো নয়

পঞ্চম দৃশ্য

১. জীবনের কিছু হলো না হায়

২. দেখ্ দেখ্, দুটো পাখি

৩. কী বলিনু আমি

৪. এ কি এ, এ কি এ, স্থিরচপলা

৫. নমি নমি ভারতী

৬. শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি মা

ষষ্ঠ দৃশ্য

১. কোথা লুকাইলে

২. কেন গো আপন মনে

৩. কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা

৪. বাণী বাণীপাণি

৫. এই যে হেরি গো দেবী

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোক্ত গানগুলি মূলতঃ বিনাতালে, ভাঙ্গাতালে বা অনিয়মিত তালে গাওয়া যায়।

বাল্মীকির গানগুলির মধ্যে বিভিন্ন ভাব ফুটে উঠেছে, অর্থাৎ নানা ভাবের সংঘাত বা দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়:

১. শোন্ তোরা তবে শোন্
২. রাঙ্গাপদপদ্মযুগে প্রণমি
৩. নিয়ে আয় কৃপাণ
৪. এ কেমন হলো মন আমার
৫. শোন্ তোরা শোন এ আদেশ
৬. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে
৭. আয় মা আমার সাথে
৮. কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই
৯. রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু
১০. জীবনের কিছু হল না হায়
১১. কী বলিনু আমি
১২. একি এ, একি এ
১৩. শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি
১৪. কোথা লুকাইলে
১৫. কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা
১৬. এই যে হেরি গো দেবী

২, ৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬- সংখ্যক গানগুলি ভাঙ্গা তালে, অথবা অনিয়মিত তালে গাওয়া হলেও অভিনয়ের দিক থেকে খুব বেশী উপযোগিতা আছে বলে মনে হয় না; কিন্তু ১, ৩, ৫, ৮, ৯ সংখ্যক গানগুলির অভিনয়গত উপযোগিতা যথেষ্ট রয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, এই গানগুলির মধ্যে যেমন আবেগের আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি সেই আবেগকে কেন্দ্র করে সুরও যেন তারই অনুগমন করেছে। সুরের দিক লক্ষ্য রেখে অভিনয়গত নির্দেশ দেওয়া হলো:

Dhaka University Institutional Repository

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই– ক

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে।

যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে খ

ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে– গ

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে। ঘ

আপনা ভুলিতে চাই, ভুলিব কেমনে

কেমনে যাবে বেদনা।

ধরি ধনু আনি বাণ গাহিব ব্যাধের গান, ঙ

দলবল লয়ে মাতিব–

কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে। চ

ক– এর পর বিরতি (pause)

খ– উঠে, দ্রুত

গ– এর পর বিরতি

ঘ– এর পর বিরতি

ঙ– দ্রুত

চ– বিরতি

এই গীতিনাট্যে নিম্নলিখিত গানগুলি বালিকার:

১. ওই মেঘ করে বুঝি গগনে

২. এ কী এ ঘোর বন

৩. কী দোষে বাঁধিলে আমায়

৪. হা, কী দশা হলো আমার

গানগুলি মূলতঃ করুণরসাত্মক। সুতরাং খুবই স্বাভাবিক, গাইবার সময় ভাবানুযায়ী বিলম্বিত লয়ে গাইতে হয়। ১ ও ২ -সংখ্যক গানে বাকী দুটি গানের তুলনায় আঙ্গিকাভিনয়ের সুযোগ বেশী আছে বলে মনে হয়। পঞ্চম দৃশ্যে বাধকের প্রবেশ। এই গানটির মধ্যেও

Dhaka University Institutional Repository

আঙ্গিকাভিনয়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। লয়ের কিভাবে পরিবর্তন আনা দরকার, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ শেষের অংশটুকু তুলে দেওয়া গেল:

বাল্মীকি। শোনো শোনো, মিছে রোষ করো না।– (বিলম্বিত)

ব্যাধ। থামো থামো ঠাকুর– এই ছাড়িলাম।– (দ্রুত)

এদিক থেকে দস্যুদের গানগুলির আঙ্গিকাভিনয়ের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী:

১. আ: বেঁচেছি এখন

২. আজকে তবে মিলে সবে

৩. এখন করব কী বল্

৪. পথ ভুলেছিস সত্যি বটে

৫. দেখো হো ঠাকুর

৬. আরে, কী এত ভাবনা

৭. ছাড়বা না ভাই

৮. রাজা মহারাজা কে জানে

৯. আ: কাজ কী গোলমালে

১০. দীনহীন এ অধম আমি

১১. কেন রাজা, ডাকিস কেন

১২. চল্ চল্ ভাই

বাল্মীকিপ্রতিভার সঙ্গে কালমৃগয়ার গায়কী বা গায়নপদ্ধতির বেশী পার্থক্য নেই। পূর্ব আলোচিতসূত্রটি এই গীতিনাট্যের গানগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য। জীবনস্মৃতির পাঠকের জানা আছে, গীতিনাট্যের কিছু অংশ অবিকৃত বা সামান্য বিকৃত অবস্থায় বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে সংযোজিত। গানগুলি যথাক্রমে :

১. ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে (রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে)

২. বনে বনে সবে মিলে (এই বেলা সবে মিলে)

৩. গহনে গহনে যা রে তোরা

৪. চল্ চল্ ভাই

৫. প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি রে

৬. ঠাকুরমশয় দেরী না সয় (সর্দার মশায় দেরি না সয়)

Dhaka University Institutional Repository

৭. আঃ বেঁচেছি এখন

৮. কে এল আজি এ

৯. এনেছি মোরা এনেছি মোরা

বনদেবীগণের 'রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে' গানটি এই গীতিনাট্যে গাইবার নির্দেশ রয়েছে:

সকলে। ঝম্ ঝম্ ঘন ঘন রে বরষে।

দ্বিতীয়। গগনে ঘনঘটা, শিহরে তরু লতা–

তৃতীয়। ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।

সকলে। দিশি দিশি চমকিত, দামিনী চমকিত–

প্রথম। চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে॥

কালমৃগয়া

কালমৃগয়া গীতিনাট্যে মোট ৩৯টি গান রয়েছে। গানগুলির সঙ্গে নিম্নলিখিত তালগুলি ব্যবহৃত।

১. বেলা যে চলে যায়– ঝাঁপতাল

২. ও ভাই দেখে যা– ত্রিতাল

৩. ও দেখবি রে ভাই– খেমটা

৪. কাল সকালে উঠব মোরা– খেমটা

৫. সমুখেতে চলিছে– ত্রিতাল

৬. ফুলে ফুলে ঢলে– খেমটা

৭. নেহারো লো সহচরী– ত্রিতাল

৮. জল এনে দে রে বাছা– ঝাঁপতাল

৯. না না, কাজ নাই– ত্রিতাল

১০. আমা-তরে অকারণে– ত্রিতাল

১১. গহন ঘন ছাইল- ত্রিতাল

১২. ঝম্ ঝম ঘন ঘন– ত্রিতাল

Dhaka University Institutional Repository

১৩. আয় লো সজনী– ত্রিতাল

১৪. কী ঘোর নিশীথ- ত্রিতাল

১৫. মানা না মানিলি– ত্রিতাল

১৬. বনে বনে সবে মিলে– কাহার্‌বা

১৭. জয়তি জয় জয় রাজন্‌– কাহার্‌বা

১৮. গহনে গহনে যা রে– দাদরা

১৯. চল্‌ চল্‌ ভাই– কাহার্‌বা

২০. প্রাণ নিয়ে তো– খেমটা

২১. ঠাকুরমশায়, দেরি না সয়– একতালা

২২. আঃ বেঁচেছি এখন– তাল ফেরতা

২৩. এনেছি মোরা, এনেছি মোরা– (তালের উল্লেখ নেই, তাল বিভাগ আছে– ১২৩। ১২৩।।)

২৪. কে এল আজি এ–তেওড়া

২৫. না জানি কোথা এলুম– ত্রিতাল

২৬. হা, কী দশা হল- ত্রিতাল

২৭. কী করিনু হায়– আড়াঠেকা

২৮. কী দোষ করেছি–ঝাঁপতাল

২৯. আমার প্রাণ যে ব্যাকুল– মধ্যমান

৩০. বলো বলো পিতা-ত্রিতাল

৩১. কে জানে কোথা– কাওয়ালি

৩২. এতক্ষণে বুঝি এলিরে– চৌতাল

৩৩. অজ্ঞানে করো হে– ত্রিতাল

৩৪. কী বলিলে, কী শুনিলাম– ত্রিতাল

৩৫. ক্ষমা করো মোরে– ঝাঁপতাল

৩৬. আহা, কেমন বধিল তোরে– আড়াঠেকা

৩৭. শোকতাপ গেল– ঝাঁপতাল

৩৮. সকলি ফুরাইল– একতাল

Dhaka University Institutional Repository

তাল নির্দেশ সত্ত্বেও, ভাবানুযায়ী যে গানগুলির অভিনয় দরকার সেকথা স্বীকার্য। এক্ষেত্রে অভিনয়ের দিকে স্বাচ্ছন্দে পূর্বালোচিত রীতি অনুসারে তালগুলিকে ভেঙ্গে গাওয়া যেতে পারে। 'আঃ বেঁচেছি এখন' অথবা 'প্রাণ নিয়ে তো সট্‌কেছি'– এই জাতীয় গানের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, এগুলি সম্পূর্ণভাবে তালে গাইলে রস ব্যাহত হয়।

এই গীতিনাট্যে যদিও তালের নির্দেশ রয়েছে, তথাপি এই নির্দেশ পুরোপুরি বজায় রেখে অভিনয় করতে গেলে নিঃসন্দেহে রসের হানি ঘটে। তবে, বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে এই গীতিনাট্যের তুলনায় বলা যায়– এই গীতিনাট্যের অভিনয়গত উপযোগিতা অপেক্ষাকৃত কম। দৃষ্টান্ত হিসেবে অন্ধঋষির 'জল এনে দে রে বাছা' গানটির উল্লেখ করা চলে:

জল এনে দে রে বাছা, তৃষিত কাতরে।
শুকায়েছে কণ্ঠ তালু, কথা নাহি সরে।।
মেঘগর্জন
না, না, কাজ নাই, যেয়ো না বাছা,
গভীরা রজনী ঘোর, ঘন গরজে–
তুই যে এ অন্ধের নয়নতারা।
আর কে আমার আছে!
কেহ নাই– কেহ নাই–
তুই শুধু রয়েছিস হৃদয় জুড়ায়ে।
তোরেও কি হারাব বাছা রে–
সে তো প্রাণে স'বে না।।

এই চরিত্রটির অভিনয়ে, বলাই বাহুল্য, আঙ্গিকাভিনয়ের খুব বেশী সুযোগ নেই, অন্ধচরিত্রের প্রকাশ স্বভাবতই সংহত হওয়া উচিত। **'জল এনে দে রে বাছা'** ও **'না না, কাজ নাই'**– গান-দুটির মধ্যে **'মেঘগর্জন'** এর নির্দেশ রয়েছে, তার জন্য অন্ধঋষির যে ব্যকুলতা, তার প্রকাশ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই মুখের অভিব্যক্তিতে হওয়া উচিৎ। গীতিনাট্য শুধু বাচিক নয়, আঙ্গিকাভিনয়ও এর একটি মূখ্য দিক।

Dhaka University Institutional Repository

মায়ার খেলা

কালমৃগয়ার আলোচনার প্রারম্ভে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মায়ার খেলা গীতিনাট্যের গানগুলির তাল-নির্দেশ দেওয়া আছে। গায়কীর দিক থেকে বলা যায়, এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের সময় তালের শাসন মেনে চলা দরকার। তালের দিকে লক্ষ্য রেখে কতিপয় গান উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

১. মোরা জলে স্থলে– একতালা

২. পথহারা তুমি– একতালা

৩. জীবনে আজ কি– কাওয়ালি

৪. কাছে কাছে –খেমটা

৫. যেমন দক্ষিণে বায়ু- কাওয়ালি

৬. মনের মতো করে– খেমটা

৭. সখী, সে গেল– খেমটা

৮. প্রেমের ফাঁদ পাতা– ঝাঁপতাল

৯. যেয়ো না, যেয়ো না– ঝাঁপতাল

১০. কে ডাকে- কাওয়ালি

১১. এসেছি গো এসেছি– খেমটা

১২. ওকে বলো সখী– খেমটা

১৩. মিছে ঘুরি– ঢিমেতেতালা

১৪. তারে দেখাতে পারি নে– ঝাঁপতাল

১৫. সখা, আপন মন– রূপক

১৬. আমি জেনে শুনে– রূপক

১৭. ভালোবেসে যদি সুখ– কাওয়ালি

১৮. দেখো চেয়ে ঝাঁপতাল

১৯. সুখে আছি, সুখে আছি– খেমটা

২০. ভালোবেসে দুখ সেও– একতালা

২১. ওই কে গো হেসে– কাওয়ালি

Dhaka University Institutional Repository

২২. দূরে দাঁড়ায়ে– তালফেরতা

২৩. প্রেমপাশে ধরা– খেমটা

২৪. ওগো, দেখি আঁখি– একতালা

২৫. ওকে বোঝা গেল না– কাওয়ালি

২৬. দিবসরজনী আমি– একতালা

২৭. সখী, সাধ করে– তালফেরতা

২৮. আমি হৃদয়ের কথা– একতালা

গীতিনাট্যে সমবেত গানগুলির (মায়াকুমারীগণের ও সখীগণের) গায়নপদ্ধতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি-প্রতিভার সমবেত গানগুলি কোরাস পদ্ধতিতে গাওয়া। কাল-মৃগয়াতে 'ঝম্ ঝম্ ঘন্ ঘন রে' গানটির আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। এই গীতিনাট্যে 'মোরা জলে স্থলে কত ছলে' গানটির নির্দেশ মূল গ্রন্থে দেওয়া আছে। 'সুখে আছি সুখে আছি' কিভাবে প্রমদা ও সখীগণ পালা করে গেয়েছে, তাও লক্ষ্য করার মতো। এই গানটির 'মধুর জীবন মধুর রজনী' থেকে শেষের অংশটুকু বিলম্বিত লয়ে গাইতে হয়। প্রথমে প্রমদা একা গাইবার পর, সকলে পালা করে গেয়ে থাকে।

১.	সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন-মনে	–	প্রমদা
২.	সুখে আছি সুখে আছি, সখা আপন মনে এবং কিছু চেয়োনা	–	সখীগণ
১.	দুরে যেয়ো না	–	প্রমদা
২.	শুধু চেয়ে দেখো	–	সখীগণ
১.	শুধু চেয়ে দেখো	–	প্রমদা
২.	শুধু ঘিরে থাকো	–	সখীগণ
৩.	শুধু ঘিরে থাকো কাছাকাছি...	–	প্রমদা ও
	আপনমনে	–	সখীগণ
১.	সখা, নয়নে ... প্রাণ	–	প্রমদা
২.	আমায় ... প্রাণ	–	সখীগণ
১.	রচিয়া ... গান	–	প্রমদা
২.	রচিয়া ... গান	–	সখীগন

Dhaka University Institutional Repository

তারপর বিলম্বিত লয়ে–

১.	গোপনে ... মালাগাছি	–	প্রমদা
২.	গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া		
	রেখে যাবে মালাগাছি	–	সখীগণ
	মন চেয়ো না, দূরে যেয়ো না		
১.	শুধু ঘিরে থাকো	–	প্রমদা
২.	শুধু ঘিরো থাকো	–	সখীগণ
৩.	সখী ঘিরে থাকো কাছাকাছি	–	প্রমদা ও
	সুখে আছি... আপন মনে	–	সখীগণ

এরই পাশাপাশি 'এস' 'এস' বসন্ত ধরাতলে; সমবেত গানটি স্মরণযোগ্য। এ গানটিও পালাক্রমে স্ত্রীগণ, পুরুষগণ এবং স্ত্রীগণ ও পুরুষগণ গেয়ে থাকে।

সবশেষে উল্লেখযোগ্য নিবলিখিত গানগুলি বিনা তালে গাইলে ভালো হয়।

১. আজি আঁখি জুড়ালো হেরিয়ে

২. কেন এলি রে, ভালোবাসিলি

৩. আর কেন, আর কেন

এই আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, গীতিনাট্যের এই গায়ন-পদ্ধতি বা গায়কী অভিনয়কেন্দ্রিক এবং তা যে বাংলা গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অভিনব, তাও স্বীকার্য। এই গায়কীর মধ্যে সঙ্গীতের একটি নতুন রূপ দেখতে পাচ্ছি। গীতিনাট্যের এই সাফল্য পরবর্তীকালে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিককে প্রভাবিত করছে। গান যে নাটকীয়তাসূত্রে বিভিন্ন ভাব প্রকাশে এবং চরিত্রের রূপায়ণে সক্ষম, গীতিনাট্যের এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের মধ্যে আর একভাবে ব্যবহার করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুর সমাবেশ

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ (কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকসঙ্গীত বা পাশ্চাত্য) সঙ্গীতের ভিত্তির উপরই রবীন্দ্র-সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে যে কথা বলেছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা স্মরণযোগ্য। **"আমি বলবো, আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না; আমরা যা কিছু সৃষ্টি করি না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি থেকে যাবে। আমাদের সেই আত্মা, সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্বতনকারে কীর্তনগানে– বাউলে ছিল। সেই-রকম আজ যদি বাঙ্গালী আপনাকে সঙ্গীতে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে, সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘণ করতে পারবে না– যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা কিছু করবে নিজেকে মুক্ত করে– নকল করে নয়।"**

- এ উক্তির মধ্যে নিশ্চয়ই বহুদিনের সাধনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় রয়েছে। কিন্তু একথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, 'নিজেকে মুক্ত করার' প্রবণতাই নকল করা থেকে দূরে রেখে তাঁকে নুতন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছে।

বাল্মীকি-প্রতিভার সুর-সমাবেশের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে, এই গীতিনাট্যে তিনি প্রায় ২৭টি রাগ-রাগিনী ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ৮টির মতো মিশ্ররাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সুরারোপের দিক থেকে গানগুলি সন্নিবেশ করা গেল:

প্রথম দৃশ্য

১. সহে না সহে না কাঁদে– সিন্ধু কাফি

২. আঃ বেঁচেছি এখন– মিশ্র সিন্ধু

৩. এনেছি মোরা এনেছি– মিশ্র ঝিঁঝিট

৪. আজকে তবে মিলে– কাফি

৫. এক ডোরে বাঁধা– খাম্বাজ

৬. এখন করব কী বল– পিলু

৭. শোন্ তোরা তবে শোন্– ঝিঁঝিট

৮. ত্রিভুবনমাঝে–বেলাবতী

৯. কালী কালী বলো রে– জংলা ভুপালী

Dhaka University Institutional Repository

১০. ওই মেঘ করে বুনি– মিশ্র ঝিঁঝিট

১১. এ কী এ ঘোর বন– দেশ

১২. পথ ভুলেছিস- পিলু

১৩. মরি ও কাহার বাছা– মিশ্র ঝিঁঝিট

দ্বিতীয় দৃশ্য

১৪. রাঙাপদপদ্মযুগে– বাগেশ্রী

১৫. দেখো হো ঠাকুর·· কাফি

১৬. নিয়ে আয় কৃপাণ– কানাড়া

১৭. কী দোষে বাঁধিলে– ঝিঁঝিট

১৮. এ কেমন হলো– সিন্ধু ভৈরবী

১৯. আরো কী এত ভাবনা– পরজ

২০. শোন্ তোরা শোন্– দেওগিরি

তৃতীয় দৃশ্য

২১. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে– খাম্বাজ

২২. ছাড়ব না ভাই– মিশ্র বাগেশ্রী

২৩. রাজা মহারাজা কে জানে– কানাড়া

২৪. আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা– খাম্বাজ

২৫. আঃ কাজ কি গোলমালে– মিশ্র সিন্ধু

২৬. হা, কী দশা– গারা ভৈরবী

২৭. এত রঙ্গ শিখেছ– ভাটিয়ারী

২৮. আহো! আস্পর্ধা·· বেহাগ

২৯.আয় মা আমার সাথে– ভৈরবী

চতুর্থ দৃশ্য

৩০. রিম্ ঝিম ঘন ঘন রে-মল্লার

৩১. কোথায় জুড়াতে আছে– বেহাগ

৩২. কেন রাজা ডাকিস– সুরট

৩৩. এইবেলা সবে মিলে– ইমনকল্যাণ

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. গহনে গহনে যা ো-বাহার

৩৫. চল্ চল্ ভাই- অহং

৩৬. কে এলে আজি-মিশ্রমল্লার

৩৭. প্রাণ নিয়ে তো– দেশ

৩৮. বলব কী আর– গৌরী

৩৯. সর্দার মশায়– শংকরা

৪০. রাখ্ রাখ্ ফেল্ ধনু– বাহার

৪১. আর না, আর না– নটনারায়ণ

পঞ্চমদৃশ্য

৪২. জীবনের কিছু হল না– হাম্বীর

৪৩. দেখ্ দেখ্ দুটো পাখি– মিশ্র পূরবী

৪৪. থাম্ থাম্ কী করিবি– সিন্ধু ভৈরবী

৪৫.কি বলিনু আমি– বাহার

৪৬. এ কি এ, এ কি এ– ভূপালী

৪৭.শ্যামা, এবার ছেড়ে– রামপ্রসাদী

৪৮. কোথা লুকাইলে– টোড়ী

৪৯. কেন গো আপন– সিন্ধু

৫০.কোথায় সে উষাময়ী-টৌড়ী

৫১. বাণী বীণাপাণি– ভৈরোঁ

৫২. এই যে হেরি গো দেবী- বাহার

এই তালিকার দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়– বাল্মীকিপ্রতিভার সুরযোজনার মূল বিশেষত্বগুলি যথাক্রমে:

১. সবগুলি গানই উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. কোনো বিশেষ আদর্শের অনুসরণে অধিকাংশ সুরারোপ করা হয়েছে।

৩. গানগুলি রাগ-রাগিনীতে রচিত হলেও নাটকের প্রয়োজনে সেগুলি নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ এই গীতিনাট্য রচনা করার সময় এই রাগ রাগিনীগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' এবং 'বসন্ত- উৎসবে' বিশেষ করে 'মানময়ী'তে, যতগুলি রাগ-রাগিনীর ব্যবহার হয়েছে তার প্রায় সবগুলিই বাল্মীকিপ্রতিভায় ব্যবহৃত। উনিশ শতকের গীতিনাট্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, ঐসব গানেও রাগ-রাগিনীর ব্যবহার রয়েছে। ৫২টির মতো রাগ-রাগিনীর ব্যবহার ঐসব গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কয়েকটি অপ্রচলিত রাগ, যেমন- কুকুভ, সরফর্দা, লুম, গারা ইত্যাদি কোনো কোনো গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাল্মীকিপ্রতিভার মধ্যেও ঐসব রাগ-রাগিনীর ব্যবহার আছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু মিশ্র রাগেরও পরিচয় পাওয়া যায় ঐসব গীতিনাট্যে। যেমন- সুরুট-খাম্বাজ, ললিত-যোগিয়া, ঝট-রামকেলি, ঝিঁঝিট-খাম্বাজ, কানাড়া-বসন্ত, গৌড়-সারাং, ভৈরব-বাহার, পঞ্চম-বাহার, সোহিনী-বাহার, পরজ-কালাংড়া ইত্যাদি। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতেও মিশ্ররাগের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে।

এই গীতিনাট্য মূলতঃ শিক্ষানবিশির ফসল বলেই, খুবই স্বাভাবিক যে, এই গানগুলিতে কোনো-না-কোনো আদর্শের অনুসরণে সুর-যোজনা করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল:

পূরোবর্তী আদর্শ	রাগতাল
অহো! আস্পর্ধা একি– দারা দ্রিম তানা না	বেহাগ, ত্রিতাল
এই যে হেরি গো দেবী- মনকী কমলদল গোলিয়াঁ	বাহার, ত্রিতাল
রিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে– রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি	মল্লার, ত্রিতাল
হা, কী দশা হলো আমার– হাল মে রবে রবা	বেহাগ-খাম্বাজ ত্রিতাল
এই বেলা সবে মিলে– চতুরঙ্গ রসঘন	
আয় মা আমার– মা একবার দাঁড়া গো হেরি চন্দ্রানন	
থাম্ থাম্ কী করিবি– যে যাতনা যতনে	

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া **'শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা'** গানটি রামপ্রসাদের গানের আদর্শে রচিত। তেলেনা গানের অনুসরণে **'এই বেলা সবে মিলে'** গানটি রচনা করা হয়েছে। আরও কয়েকটি গানে অনুরূপ ঙও চোখে পড়া বিচিত্র নয়। **'কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে'** গানটিও **'এ ভরা বাদর'** গানের সুর অনুসরণ করেছে। ইন্দিরা দেবী তাঁর স্মৃতিকথার মধ্যে বলেছেন যে, তৎকালীন ব্যান্ডসঙ্গীতের আদর্শেও কোনো কোনো গান রচিত। যেমন **'এনেছি মোরা এনেছি মোরা'** গানটি। সম্ভবতঃ শুধু দস্যুদের সমবেত গানেই এই প্রভাব পড়েছে। **'তবে আয় সবে আয়'** গানটিও এদিক থেকে স্মরণীয়। তা ছাড়া তিনি প্রত্যক্ষভাবে **'মরি ও কাহার বাছা'** এবং **'কালী কালী বলো রে আজ'** গানদুটি যে যথাক্রমে টমাস ম্যুরের **'Go where glory waits thee'** এবং স্টিফেন অ্যাডম্‌স্‌-এর **'Nancy Lee'**-র আদর্শে রচিত। মূল গানের সুর বা তাল তিনি গীতিনাট্যের গানের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। মূল সুরের বিকৃতি বা ব্যতিক্রম প্রায় ঘটে নি বললেই হয়। যেমন **'অহো আস্পর্ধা একি'** গানটি মূলেও ছিল বেহাগে। টমাস ম্যুর বা স্টিফেন অ্যাডম্‌স্‌-এর গান দুটির সুরও যথাযথভাবে বজায় রাখা হয়েছে। **Nancy Lee** গানটির প্রথমে নির্দেশ রয়েছে **'with Spirit'** এবং বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ উদ্দীপনামূলক সুর হিসেবেই তা ব্যবহার করেছেন।

প্রাসঙ্গিকবোধে জীবনস্মৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণ করা যায়- **'এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল। ইহার সুরগুলি অধিকাংশই দিশি, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা, আশা করি, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সঙ্গীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব।'**

বাল্মীকিপ্রতিভার সুর-সমাবেশের এইটেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক যে, ভারতীয় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীগুলিকে সর্বপ্রথম এই গীতিনাট্যে নতুনরূপে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন, এ সঙ্গীত অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনলে এর কোনো স্বাদগ্রহণ সম্ভবপর নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, রাগ-রাগিনীগুলি যেখানে যে ভাবের সঙ্গে খাপ খায়, সেখানে তিনি সেইভাবেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথার সঙ্গে রাগ-রাগিনীর রূপটি ঠিকমতো বজায় রেখেও এমনভাবে সাজিয়েছেন, যার ফলে রাগ-রাগিনীর চরিত্র বদলে গেছে। কথার (ভাবের) সঙ্গে মিলিয়েই রাগ-রাগিনীগুলি ব্যবহার করেছেন; যেখানে তা হয় নি সেখানে সুরকে ছন্দের বা তালের সাহায্যে জোড়ালো করেছেন, বা তার চাল বদলে দিয়েছেন।

দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি:

১. সহে না সহে না কাঁদে পরান– সিন্ধু কাফি

২. আয় মা আমার সাথে– ভৈরবী

৩. রিম্ রিম্ ঘন ঘন রে– মল্লার

৪. কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই– বেহাগ

৫. রাঙ্গাপদ-পদ্মযুগে-মিশ্র বাগেশ্রী ইত্যাদি।

এই গানগুলিতে প্রচলিত প্রথাকে যথাযথ বজায় রাখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই পর্যন্ত সাঙ্গীতিক শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনেছেন বা বলা যায়, প্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন করেন নি। কিন্তু আসল কৃতিত্ব এখানে নয়, এই কৃতিত্ব একই রাগ-রাগিনীকে নানাভাবে ব্যবহারের মধ্যে- কোথাও জোরালো, কোথাও বা কোমল। দৃষ্টান্ত হিসেবে সিন্ধুতে রচিত কয়েকটি গানের উল্লেখ করা গেলো:

১. সহে না সহে না কাঁদে পরান- সিন্ধু কাফি

২. আঃ বেঁচেছি এখন- মিশ্র সিন্ধু

৩. এ কেমন হল মন- সিন্ধু ভৈরবী

৪. কেন গো আপন মনে– সিন্ধু

ভৈরব রাগের অন্তর্গত সৈন্ধবী বা সিন্ধুকে কিভাবে ব্যহার করা হয়েছে তা লক্ষ্য করার মতো। ভৈরব রাগের অন্তর্গত বলে সিন্ধুর আবেদন করুণ রস। এর ধ্যান-বর্ণনায় তার পরিচয় রয়েছে, যেখানে রূপ-কল্পনার মধ্যে বৈরাগ্যের চিত্র অঙ্কিত। অনুরূপ-ভাবে ঝিঁঝিটে কয়েকটি গানের দৃষ্টান্ত স্মরণযোগ্য:

Dhaka University Institutional Repository

১. এনেছি মোরা এনেছি মোরা– মিশ্র ঝিঁঝিট

২. শোন্ তোরা তবে শোন্– ঝিঁঝিট

৩. কী দোষে বাঁধিলে আমায় ঝিঁঝিট

প্রথম দুটি গানই উদ্দীপক, কিন্তু ভিন্ন চালের। ৩-সংখ্যক গানটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তেমনি খাম্বাজে রচিত:

১. এক ডোরে বাঁধা আছি– খাম্বাজ

২. ব্যাকুল হয়ে বনে বনে– খাম্বাজ

৩. আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা– খাম্বাজ

এই তিনটি গানই স্বতন্ত্র প্রকৃতির, প্রথমটি ভাব উদ্দীপক, দ্বিতীয়টির করুণ, শেষেরটি হাস্যরসাত্মক।

কালমৃগয়া

উপরুক্ত আলোচনারই সূত্র ধরেই কালমৃগয়া গীতিনাট্যের আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়। এই গীতিনাট্যের ৩৯টি গানের মধ্যে ৯টি গান পরিবর্ধিত বাল্মীকি-প্রতিভার মধ্যে স্থান পেয়েছে। বাকী ৩০টি গানের রাগ-সমাবেশ যথাক্রমে:

১. বেলা যে চলে যায়– মিশ্র ভূপালী

২. ও ভাই দেখে যো– মিশ্র খাম্বাজ

৩. ও দেখবি রে ভাই- মিশ্র খাম্বাজ

৪. কাল সকালে– মিশ্র বিভাস

৫. সমুখেতে বহিছে তটিনী– সিন্ধু

৬. ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে– কেদারা

৭. নেহার লো সহচরী– ছায়ানট

৮. জল এনে দে রে বাছা– জয়জয়ন্তী

৯. না না কাজ নেই– দেশ

১০. আমা-তরে অকারণে– খাম্বাজ

১১. সঘন ঘন ছাইল– মিশ্র মল্লার

Dhaka University Institutional Repository

১২. আয় লো সজনী– মল্লার

১৩. কী ঘোর নিশীথ– গারা

১৪. মানা না মানিলি– মিশ্র বেলাবল

১৫. জয়তি জয় জয় রাজন– সিন্ধুড়া

১৬. না জানি কোথা এলুম– লুম–খাম্বাজ

১৭. হায় কী হল– ভৈরবী

১৮. কী করিমু হায়– বেহাগ

১৯. কী দোষ করেছি– মিশ্র খট

২০. আমার প্রাণ যে ব্যাকুল– মিশ্র ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

২১. বলো বলো পিতা– রামকেলি

২২. কে জানে কোথা সে– বেহাগ- খাম্বাজ

২৩. এতক্ষণে বুঝি এলি– কাফি–কানাড়া

২৪. অজ্ঞানে করো হে ক্ষমা–মিশ্র রাজবিজয়

২৫. কী বলিলে– মিশ্র বাহার

২৬. ক্ষমা করো মোরে– মিশ্র বেহাগ

২৭. আহা কেমনে বধিল– কাফি

২৮. শোক তাপ গেল দূরে– নটনারায়ণ

২৯. যাও রে অনন্তধামে– প্রভাতী

৩০. সকলি ফুরালো– ঝিঁঝিট-খাম্বাজ

এই তালিকার অনুসরণে বলা যায়, এই গীতিনাট্যে ২৬টির মতো রাগ-রাগিনী ও ১৮টির মতো মিশ্ররাগ ব্যবহৃত। এখানেও ভাবানুযায়ী রাগ-রাগিনীগুলি সংযোজিত।

মায়ার খেলা

এ দিক থেকে মায়ার খেলা গীতিনাট্য কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সেই আলোচনায় আগে রাগ-সমাবেশের দিক থেকে গানগুলি সন্নিবেশ করা গেল। এই গীতিনাট্যের ৬৩টি গানে ৩৬টির মতো রাগ-রাগিনীর ব্যবহার করা হয়েছে; তার মধ্যে মিশ্র ১৬টি। গানগুলি যথাক্রমে:

Dhaka University Institutional Repository

১. মোরা জলে স্থলে– সিন্ধু

২. পথহারা তুমি পথিক- ইমনকল্যাণ

৩. জীবনে আজ কি প্রথম– মিশ্র বাহার

৪. কাছে আছে দেখিতে না পাও··· কাফি

৫. আমার পরান যাহা চায়– মিশ্র কানাড়া

৬. সখী সে গেল কোথায়– বেহাগ

৭. দে লো সখী দে– দেশ

৮. সখী, বহে গেল বেলা– মিশ্র ভূপালী

৯. ওলো রেখে দে– খাম্বাজ

১০. প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে– জিলফ্

১১. যেয়ো না যেয়ো না– ছায়ানট

১২. কে ডাকে। আমি কভু– বসন্ত-বাহার

১৩. এসেছি গো এসেছি– পিলু

১৪. মিছে ঘুরি এ জগতে– বেলাবলী

১৫. তারে দেখিতে পারি নে– জয়জয়ন্তী

১৬. সখা, আপন মন– ভৈরবী

১৭. আমি জেনেশুনে– মল্লার

১৮. ভালোবেসে যদি– কাফি

১৯. দেখো চেয়ে– বেহাগড়া

২০. সুখে আছি– মিশ্র ঝিঁঝিট

২১. ভালোবেসে দুখ– মুলতান

২২. ওই কে গো– হাম্বীর

২৩. প্রেমপাশে ধরা- কালাংড়া

২৪. ওগো, দেখি– মিশ্র সুরট

২৫. ওকে বোঝা গেল না– ঝিঁঝিট

২৬. দিবসরজনী– মিশ্র সিন্ধু

২৭. সখী, সাধ করে– বাহার

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আমি হৃদয়ের কথা– মিশ্র সিন্ধু

২৯. নিমেষের তরে শরমে– সিন্ধু

৩০. ওগো সখী দেখি– পিলু

৩১. এ তো খেলা নয়– সরফর্দা

৩২. সে জন কে– মিশ্র দেশ

৩৩. ওই মধুর মুখ– মিশ্র ভৈরবী

৩৪. তারে কেমনে ধরিবে– মিশ্র ভৈঁরো

৩৫. সকল হৃদয় দিয়ে– মিশ্র কানাড়া

৩৬. তুমি কে গো– কেদারা

৩৭. তবে সুখে থাকো– বেহাগ

৩৮. সেই শান্তিভবন– কাফি

৩৯. কাছে ছিলে– অলাইয়া

৪০. দেখো ভুল করে– কুকভ

৪১. ভুল করেছিনু ভুল- ললিত-বসন্ত

৪২. অলি বারবার– মিশ্র দেশ

৪৩. ওই কে আমায় ফিরে– পূরবী

৪৪. বিদায় করেছ– কানাড়া

৪৫. সেদিনো তো মধুনিশি– কানাড়া

৪৬. না বুঝে কারে– ভূপালী

৪৭. আমি কারেও বুঝি নে– বেহাগ

৪৮. প্রভাত হইল– বিভাস

৪৯. মধুনিশি পূর্ণিমার– কেনাড়া

৫০. এস' এস' বসন্ত– সাহানা

৫১. মধুর বসন্ত এসেছে–+ সাহানা

৫২. আজি আঁখি জুড়াল– মিশ্র মূলতান

৫৩. একি স্বপ্ন- বেহাগ

৫৪. আহা আজি এ বসন্তে– মিশ্র ঝিঁটি

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. আমি তো বুঝেছি সব– ঝিঁঝিট

৫৬. এতদিন বুঝি নাই– গৌড়সারং

৫৭. চাঁদ, হাসো হাসো– সোহিনী

৫৮. আর কেন, আর কেন– ভৈরবী

৫৯. এ ভাঙ্গা সুখের– মিশ্র খট

৬০. যদি কেহ নাহি চায়– রামকেলি

৬১. দুখের মিলন– টোড়ী

৬২. কেন এলিরে– ভৈরবী

৬৩. এরা সুখের লাগি– মিশ্র বিভাস

প্রথমটির ক্ষেত্রে গানই মুখ্য; দ্বিতীয়টি সংলাপেরই সহযোগী; শেষেরটিতে সংলাপের বক্তব্য পুনর্বর গানের মধ্যে প্রকাশিত। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যে আসলে সঙ্গীত (সুর) ঐ সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। কালমৃগয়াও সমজাতীয় রচনা। তবে নাটকীয়তার দিক থেকে তেমন বিশেষ চমৎকারিত্ব নেই। দৃশ্যবন্ধের মধ্যে শৈথিল্য চোখে পড়ে। এখানে সঙ্গীত (সুর) নাট্যরসের সহায়ক হয়ে উঠেছে। মায়ার খেলা ঠিক এর বিপরীতে। গীতিনাট্যের গানগুলি এককভাবে সাধারণতঃ গাওয়া হয় না। মায়ার খেলার গানগুলি কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বা এককভাবে গাইবার বিশেষ উপযোগী অর্থাৎ স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই শ্রীশান্তি দেব ঘোষ ঠিকই বলেছেন যে, ইতালীয় অপেরার সঙ্গে এই গীতিনাট্যের মিল রয়েছে। বস্তুতঃ বাল্মীকিপ্রতিভার গানগুলি নাট্যপ্রধান এবং মায়ার খেলার গানগুলি আবেগ-প্রধান। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণযোগ্য:

ক. বাল্মীকিপ্রতিভা থেকে–

প্রথম দস্যু। আজকে তবে মিলে সবে করব লুটে ভাগ–

এ-সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞ-যাগ।

দ্বিতীয় দস্যু। কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগে,

ভাগের বেলায় আসেন আগে আরে দাদা!

প্রথম দস্যু। এত বড়ো আস্পর্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি-তামাশা।

Dhaka University Institutional Repository

এখখনি মুণ্ড করিব খণ্ড, খবর্দার রে খবর্দঅর!

দ্বিতীয় দস্যু। হাঃ হাঃ, ভায়া খাপ্পা বাড়ো, এ কী ব্যাপার!
আজি বুঝি বা বিশ্ব করবে নস্য, এম্‌নি যে আকার!

খ. মায়ার খেলা থেকে–

সখীগণ। অলি বার বার ফিরে যায়,
অলি বার বার ফিরে আসে–
তবে তো ফুল বিকাশে।

প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাজে, মরে ত্রাসে।
ভুলি মান অপমান দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহো পাথে।

দ্বিতীয়া। ওগো আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও
হৃদয়রতন-আশে।

সকলে। ফিরে এসো ফিরে এসো, বন মোদিত ফুলবাসে।
আজি বিরহরজনী, ফুল্ল কুসুম শিশিরসলিলে ভাসে।

বাল্মীকি প্রতিভা হচ্ছে গানের আকারে সংলাপ– মায়ার খেলা সংলাপের ছলে গান; রবীন্দ্রনাথের কথায় গানের সূত্রে নাট্যের মালা এবং নাট্যের সূত্রে গানের মালা। বাল্মীকি প্রতিভার এই সংলাপধর্ম আবার অন্য দুখানি গীতি-নাট্যের তুলনায় অনেক বেশী; বাক-রীতির সঙ্গে অভিন্ন:

১. বলো হো হো হো
২. হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ
৩. রাখো রাখো রাখো বাঁচাও আমায়
৪. দূর দূর দূর, আমরে আর ছুঁস নে
৫. এ পাপ আর না, আর না, আর না
৬. এখন কেন করছ, বাপু, উঁ উঁ উঁ
৭. চল্ চল্ চল্– এখনি যাই

Dhaka University Institutional Repository

৮. এ বনে এসো না, এসো না, এসো না

কালমৃগয়াতে এই বৈশিষ্ট্য নেই। মায়ার খেলাতে মাত্র একটি গানে (ভালোবেসে দুখ সেও সুখ) এই বিশেষত্ব চোখে পড়ে (যেমন-- না না না, সখা; মন দাও দাও, দাও সখী)। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়- নৃত্যনাট্যের গানের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কবির শেষ জন্মবার্ষিকীতে একটি নৃত্যানুষ্ঠান

[শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে]

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্যের রূপান্তর

রূপান্তরের আলোচনা নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, সেই কারণেই অপরিহার্য। রবীন্দ্রসাহিত্যের সর্বত্রই অবশ্য এই রূপান্তর চোখে পড়ে। সে আলোচনা প্রসঙ্গান্তর। গীতিনাট্যের বিষয়গত ও আঙ্গিকগত রূপান্তরের দুটি দিক। এক, মূলকাহিনীর– দুই, রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনার। গুরুত্বের দিক থেকে নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টির দাবীই বেশী, কেননা, লেখকমাত্রই কাহিনীর উপজীব্য হিসেবে প্রাচীন বা প্রচলিত কাব্য ও কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে থাকেন। সেই গৃহীত উপাদান লেখকের ব্যক্তিত্বে বা সৃজনীক্ষমতার গুণে নবরূপায়নে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। একদিক থেকে বলা যায়, এই রূপান্তর সৃষ্টিরই নামান্তর। বরং ঐদিক থেকে লেখকের নিজের লেখার রূপান্তর অপেক্ষাকৃত বেশী আলোচনার যোগ্য; তার মধ্যে লেখকের মানসিক পরিবর্তন ও শিল্পচেতনার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি আঙ্গিকের বৈচিত্রের প্রসঙ্গটিও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্যের ক্ষেত্রে এই দ্বৈত রূপান্তরই লক্ষ্য করা যায়। বাল্মীকিপ্রতিভার কাহিনী হল– দস্যু বাল্মীকির কবি-বাল্মীকিতে পরিণতি। মূল কাহিনী রামায়নের। রামায়নে বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে এই কাহিনীর যোগসূত্র নিতান্তই সূক্ষ ও দূরবর্তী। পার্থক্যও সুস্পষ্ট। (প্রসঙ্গক্রমে কাহিনী কাব্যের 'ভাষা ও ছন্দ কবিতার কথাও স্মরণীয়।) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রচিত এই গীতিনাট্য প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, **'এই সারদামঙ্গলের আরম্ভ স্বর্গ হইতেই বাল্মীকি-প্রতিভার ভাবটা আমার মাথায় আসে এবং সারদামঙ্গলের দুই একটা কবিতার রূপান্তরিত অবস্থায় বাল্মীকি-প্রতিভায় গানরূপে স্থান পাইয়াছে।'**

প্রেরণার দিক থেকে মূল রামায়ণ ও বিহারীলালের **'সারদা মঙ্গল'** এর ভূমিকা স্বীকার করেও এই গীতিনাট্যের কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রসৃষ্টিতে অভিনবত্বই চোখে পড়ে। এবং তা যেমন মূল রামায়নের থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি সারদামঙ্গলের সঙ্গেও অমিলটাই বেশী। এই গীতিনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বাল্মীকির চরিত্রটি কবি যে পরিবেশ ও পটভূমিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তারই স্বাক্ষর রয়েছে। দস্যুবৃন্দ, বালিকা, বনদেবীগণ, সবশেষে লক্ষ্মী সরস্বতীর আবির্ভাব– এসবই কবির কল্পনাসজ্জাত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গক্রমে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কালমৃগয়ার কথাও স্মরণযোগ্য। এই গীতিনাট্যের কাহিনীও রামায়ণ থেকেই নেওয়া। দশরথ মৃগয়াকালে অন্ধমুনির পুত্রকে মৃগভ্রমে বধ করেন, এই কাহিনীই রবীন্দ্রনাথের উপজীব্য। লক্ষ্যণীয়, এই গীতিনাট্যের শিকারীগণ, বন-দেবী, লীলা, বিদূষক-চরিত্রগুলি মৌলিক সৃষ্টি।

আলোচিত গীতিনাট্য দুটির কাহিনীগত প্রেরণা রামায়ণের গীতিনাট্য মায়ার খেলার মধ্যেই সর্বপ্রথম দেখা গেল স্বতন্ত্র সৃষ্টির প্রয়াস। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা দরকার। ইতিমধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'মানময়ী' এবং তার আগে স্বর্ণকুমারী দেবীর 'বসন্ত উৎসব' ঠাকুর-পরিবারে ঘরোয়া পরিবেশে অভিনীত হয়েছিল। এ দুখানি গীতিনাট্যের কাহিনীগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ মায়ার খেলা গীতিনাট্যেই সর্বপ্রথম মৌলিকত্ব দেখালেন সব দিক থেকে। গদ্যনাটক নলিনীর সঙ্গে এই গীতিনাট্যের সাদৃশ্য রয়েছে। মায়ার খেলাকে নলিনীরই রূপান্তর বলা যায়।

আঙ্গিকের রূপান্তর ছাড়াও বাল্মীকি-প্রতিভার রূপান্তর আর একাধিক থেকে উল্লেখযোগ্য-তা হচ্ছে ভাবের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন ঘটেছে অবশ্য বাল্মীকি-চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই গীতিনাট্যের প্রতিপাদ্য-কাহিনীর সঙ্গে মূল রামায়ণ বা কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অংশের তুলনা করলেই দেখা যাবে– বাল্মীকি চরিত্রটি নতুন রূপে অঙ্কিত। এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবির একটি বিশেষ বক্তব্য ফুটে উঠেছে। কাহিনী কাব্যের কাব্যনাট্যগুলির বিশেষ করে গান্ধারীর আবেদন বা কর্ণকুন্তীসংবাদ-এর মধ্যেও দেখা যায় চরিত্রগুলি এক-একটি ভাবের দ্যোতক। বাল্মীকি- চরিত্রও তাই। এই গীতিনাট্যের মধ্যেই উত্তর-কালের মানব বা প্রেমধর্মের বীজটি নিহিত। কবি জীবনের শুরুতেই যে অন্তদৃষ্টির পরিচয় পেলাম বাল্মীকির চরিত্রে, তা সত্যিই দূলর্ভ ও বিস্ময়কর। যথার্থই তিনি এ বিষয়ে কৃত্তিবাস-বিহারীলালকে অতিক্রম করে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্যের মঞ্চকলা ও রূপসজ্জা

রবীন্দ্রনাট্যকলার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চকলার বিবর্তনও নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য। এই ধারাবাহিক বিবর্তনের পথে মঞ্চকলা নিয়ে যে বিচিত্র সমীক্ষা ও পরীক্ষা করা হয়েছে, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চোখে পড়ে এর এক প্রান্তে রয়েছে গীতিনাট্যের যুগ, অপর প্রান্তে নৃত্যনাট্যের পর্ব আর বাল্মীকি-প্রতিভা তারই ভূমিকা রচনা করেছে।

বাস্তবিকপক্ষে নাট্যকলার সঙ্গে মঞ্চকলার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শুধুমাত্র জীবনচেতনা বা কাব্যচেতনা নয়, অভিনয় যোগ্যতা মঞ্চের উপযোগিতা দর্শকের উপস্থিতি ও রসবোধ– এসবের দিকে তাকিয়ে নাটক রচনা করতে হয়। এদিক থেকে নাট্যকারের স্বাধীনতা যেমন (রচনা দিক থেকে) সীমাবদ্ধ তেমনি দায়িত্ব অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, দেশকালের পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ বলেই বিশেষ বিশেষ যুগে প্রত্যেক দেশেই বিশিষ্ট মঞ্চকলার সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন ও বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সমতা রেখেই মঞ্চ কলাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। Arnott এভাবে দু শ্রেণীর মঞ্চকলার কথা উল্লেখ করেছেন– that of convention and that of illusion.' এই সঙ্গে তাঁর অভিমত হচ্ছে বর্তমান যুগ 'largely dominated by the theatre of illusion.

বাল্মীকি-প্রতিভার আগে যেসব নাট্যাভিনয় হয়েছিল, মঞ্চকলার দিক থেকে উনিশ শতকের মঞ্চকলারই পরিচয় পাই সেইসব অভিনয়ে। দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়:

'অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও ভদ্রলোকেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। অভিনয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত হইয়ছিল। স্টেজও যতদুর সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল।'

Dhaka University Institutional Repository

এই সঙ্গে:

'দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদূর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে সত্যিকারের বনের মতোই বোধ হইত। এই সব জোনাকি পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল'।

পুনশ্চ-

'ঝড়বৃষ্টির একটি দৃশ্য ছিল- তাহাতে সত্য সত্যই ঝর ঝর করিয়া জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টি ধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল'।

অন্যত্র–

সীনও যেখানে যেমনটি দরকার, পুকুরঘাট রাস্তা; স্টেজ আর্ট যতটুকু রিয়ালিস্টিক হতে পারে হয়েছিল। একটা বনের দৃশ্য ছিল, অন্ধকার বনের পথ,... সেই বনের সীন এলেই রবি ঠাকুর অন্ধকার বনপথে জোনাকি পোকা মুঠো মুঠো করে ছেড়ে দিতেন।

রঙ্গমঞ্চের এই ঐতিহ্যের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মঞ্চের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ। বাংলার লৌকিক মঞ্চকলার বা নাট্যকলার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে অনেক পরে। হয়তো বা মঞ্চকালার ঐ কৃতিমতা প্রথম থেকেই তাঁর চোখে পড়েছিল। তাই বলা হয়েছে, সম্ভবত: এ কথা ভেবেই 'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যকালে নাটক ও অভিনয়ে যে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্পষ্টবোধের অগোচরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাহা বাংলাদেশের যাত্রাগান, কৃষ্ণলীলা, নিমাই-সন্যাস নহে, তাহা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় আদর্শে গড়া থিয়েটারের অনুসরণে রচিত নাটকের অভিনয়। এইসব অভিনয়ের ক্ষীণ স্মৃতি-কণিকাগুলি বালকের অবচেতন স্তরে সঞ্চিত ছিল এবং উত্তরকালে পূর্ণাঙ্গ আর্টরূপে কবির জীবনে প্রকাশ পায়।'

মঞ্চের এই বাস্তবানুকৃতির প্রবণতার সঙ্গে রূপসজ্জার মধ্যেও পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণও লক্ষ্য করা যায়। মঞ্চসজ্জায় দামী ভেলভেট, সিল্কের কাপড় ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। সেই সঙ্গে পোষাকের মধ্যেও রীতিমতো বনেদিয়ানা ফুটে ওঠে। বাল্মীকির পোশাক তৈরি হয়েছিল ইউরোপীয় আদর্শে– পিঠের দিকে যে লম্বা জোব্বা মতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে

Dhaka University Institutional Repository

বিলিতী রাজরাজাদের mantle এর আভাস পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালা। দস্যুদের সাজসজ্জাদের মধ্যে যে 'বাস্তবতা' দেখি, তা মনগড়া দুটি কারণে– এক, তরুণ প্রযোজকগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব বা অল্পতা, আর সেই বাস্তবের রূঢ়তা ও স্থূলতা একটু শোভন সহনীয় না করে নিয়ে উপায় ছিল না; তাই এদের কাবুলীওয়ালাদের মতো সাজ **'ইয়া গোঁফ এবং ইয়া পাগড়ি'**। রীতিমতো ভীতিব্যঞ্জক সেই পোশাক! বাংলাদশের দস্যু বা ডাকাতদের যে স্বাভাবিক বর্ণনা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে খালি গায়ে কালিঝুলি-মাখা! অথচ মঞ্চে পুরোপুর এই সজ্জা শোভন নয়। এই জন্যেই বলছি, এ বাস্তবতা মনগড়া বা মনোকল্পিত।

মঞ্চকলার সঙ্গে চিত্রকলার একটা যোগ ছিল। তৎকালীন ভারতীয় চিত্রশিল্পে রবিবর্মা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রূপকল্পনার মধ্যে পশ্চিমী Illusion সৃষ্টির প্রবণতাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। পরবর্তীকালে অবশ্য সাজসজ্জার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। দস্যুদের আগের রূপসজ্জার বদলে দেখা দিল ধুতি, ফতুয়া, পাগড়ির বদলে মাথায় 'একটা ফেটি বাঁধা'। ইন্দিরা দেবীর অভিমত– এইসব অভিনয়ের আদ্য মধ্য আন্তরূপের রূপসজ্জা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। খুবই স্বাভাবিক যে আদিযুগে মঞ্চকলা বা সাজসজ্জার এই আদর্শ পরবর্তীযুগে অনুসৃত হয় নি। বস্তুত: Arnott রঙ্গমঞ্চের কথা বলতে গিয়ে যে Illusion-এর কথা বলেছেন, এই পর্বের মঞ্চকলায় ঐ আদর্শই লক্ষ্য করা যায়। পোশাকে আগেকার জৌলুষ ছিল 'সখাদের বেশ ছিল খুব টকটকে রঙ্গের সাটিনের পাঞ্জাবি ও ধুতি, তার সঙ্গে ঈষৎ গোঁফের রেখা। আর মায়াকুমারীদের হাতের দন্ডের মুন্ডে ইলেকট্রিক আলো জলছিল আর নিভছিল, বোধ হয় বিলিতি পরীর অনুকরণে। তখন সব বিষয়ে বিলিতী অনুকরণটাই প্রবল ছিল।

এ থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ইউরোপীয় মঞ্চকলার গীতিনাট্যগুলি নাট্যকলার দিক থেকে উৎকর্ষ লাভ করলেও মঞ্চকলার দিক থেকে এই গীতিনাট্যগুলিতে কোনো উল্লেখযোগ্য মৌলিকতা দেখা যায় নি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কোনো মৌলিক নির্দেশের কথা জানা যায় না। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য যে, স্টেজসজ্জায় তখনো তাঁদের হাত পড়ে নি। মনে হয় প্রকারান্তরে তিনিও এই কথাই বলতে চেয়েছেন। ঘরোয়া পরিবেশের গণ্ডী অতিক্রম করে বাস্তবতার মোহ কাটিয়ে রবীন্দ্রমঞ্চকলা পরবর্তী কালে বিবর্তনের পথে এগিয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্যের কাব্যবস্তু

কাব্যের মানদন্ডে গীতিনাট্যের বিচার যুক্তিযঙ্গত নয়। কেননা এখানে গীতরসই মুখ্য, কাব্যরস নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন- **'বাল্মীকিপ্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে...।'** গীতিনাট্যগুলি সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে একথা প্রযোজ্য। গান ও কবিতার মূল পার্থক্য হচ্ছে- গানে শব্দগত ধ্বনি ছাড়াও স্বরধ্বনির মিলন ঘটে এবং তারই ফলে প্রসঙ্গান্তরে আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্ত যাকে 'রসধ্বনি' বলেছেন তারও উদ্ভব হয়। কথা ও সুরের এই যোগপতনের কারণে পুরোমাত্রায় কথা বা শব্দগত ধ্বনির মধ্যেই ছন্দ বা তাল আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন হয় না। এই কারণেই গান ঠিক সুনিয়মিত ছন্দে রচিত পাঠযোগ্য কবিতা নয়। জীবনের প্রভাত-লগ্নে যা কিছু তিনি অনুভব করেছিলেন– যে অভিজ্ঞতা তিনি প্রথম জীবনে লাভ করেছিলেন– ব্যথা, বেদনা, শিল্পানুভূতি, সাহিত্যপাঠ, সুখদুঃখ– এসবই কবির সারাজীবনের সমস্ত সাহিত্যের সম্পদ ও উপাদানরূপে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল।

বাল্মীকিপ্রতিভা থেকে মায়ার খেলা পর্যন্ত এই পর্বটিকে সংকুচিত করে এর মধ্যে কবিমানসের সন্ধান করতে গেলে ঐ কথাগুলিই মনে পড়ে। দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই বাল্মীকির মধ্যে একটা ব্যাকুলতা জেগেছে:

> এ কেমন হল মন আমার।
> কী ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারি নে।
> পাষাণ হৃদয় গলিল কেন রে।
> কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে!
> কী মায়া এ জানে গো
> পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
> সব ভেসে গেল গো, সব ভেসে গেল গো–
> মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে।।
> এবং-
> কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই, কেন প্রাণ কাঁদে রে!

Dhaka University Institutional Repository

বাল্মীকি-চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র কিভাবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাটকে দেখা দিয়েছে, 'রূপান্তরের' আলোচনায় সে কথা উল্লেখ করেছি। সে কথা স্মরণ করে বলতে পারি, আসলে এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের এক সত্যরূপ উদঘাটন করেছেন। পাপ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত এই যে, আংশিকের প্রতি আসক্তিবশতঃ সমগ্রের প্রতি অন্যায়।

কালমৃগয়া এ গিক থেকে বাল্মীকি-প্রতিভার সঙ্গে তুলনীয় নয়। নাট্যরসের মতো ভাবের দিক থেকেও বিশেষ কোনো গভীরতা চোখে পড়ে না। সে দিক থেকে বরং মায়ার খেলা অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য সামগ্রিকভাবে কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনীর ভাবগত স্বজাত্য ছাড়াও এই গীতিনাট্যের উপজীব্য প্রেম সম্বন্ধে কবির ধারণাটি উত্তরকালে নানা লেখায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে। এই কাহিনীর উপজীব্য– প্রেমের বিচিত্র রূপের স্বরূপ উদঘাটন। অমর, শান্তা ও প্রমদাকে ভালোবেসেছে। প্রমদাও অমরকে ভালোবাসে, তবে সে ভালোবাসা চপল; নিজেকে সখীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। স্বভাবতই প্রত্যাখ্যান ভেবে অমরকে ফিরতে হয় শান্তার কাছে। শেষে প্রমদা যখন আবার দুজনের মাঝে গিয়ে উপস্থিত হল– অমর ও শান্তার কাছে তার 'গোপন কথা' প্রকাশিত হল। গভীর বেদনা বুকে নিয়ে ফিরতে হলো তাকে। প্রমদা তাই মধ্যবর্তিনী, বিচিত্র প্রেমের মূর্তিমতী। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীও এই গীতিনাট্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে অন্য দিক থেকে বলেছেন যে, এখানে প্রেম সম্বন্ধে পরিণত ধারণার পূর্বাভাস ফুটে উঠেছে। সে ধারণা হচ্ছে প্রথমতঃ প্রেমের পরিপূর্ণতার জন্যে বিরহ ও দুঃখের প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত প্রেমের মোহ বা রোমান্সের চেয়ে মানুষের পক্ষে আশ্রয়ের প্রয়োজন বেশী। এই মন্তব্য গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বস্তুতঃ কবির প্রেমচেতনাই মায়ারখেলা গীতিনাট্যে ফুটে উঠেছে। প্রেম বিচিত্র বলেই বাইরে থেকে তার সবটুকু পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা মনের অন্তরালে সে তার আপন বাণী লিখে যায়। এই বিচিত্র প্রেমজালে নরনারী ধরা পড়ে; ধরা দিতে বাধ্য হয়। অবশেষে একটু একটু করে সেই রহস্যের আবরণ সরে যেতে থাকে; তখন সেই প্রান্তভূমিতে দাঁড়িয়ে পুলক ও বেদনায় অভিভূত হয়ে পরস্পরকে চিনতে পারে। এই তো প্রেমের স্বরূপ, প্রেমের বিচিত্রতা! আর বিশ্ব জুড়ে এমনিই ফাঁদ পাতা রয়েছে প্রেমের–

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে–
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্যের প্রকৃতি ও পরিসীমা

পূর্ববর্তী আলোচনার ক্ষেত্রে গীতিনাট্যগুলির প্রকৃতি ও পরিসীমা, সেই সঙ্গে পূর্বভাষণে উল্লিখিত মূল সুরের যথার্থ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নাটকের বা গীতিনাট্যের দুটি প্রধান উপাদানের কথা বলা হয়েছে– অভিনয় ও কথা বা গান। এই প্রসঙ্গেই নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণীয়:

১. অভিনয়কে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়– সাধারণ অভিনয় ও নৃত্য-অভিনয়।

২. সাধারণ অভিনয় গদ্যের মতো– ছন্দ আছে কিন্তু তা প্রচ্ছন্ন বা 'অনিয়মিত'; পক্ষান্তরে নৃত্য-অভিনয় কবিতার মতো, ছন্দ ব্যক্ত বা সুনিয়মিত।

৩. গীতিনাট্যের কথা অংশ কবিতা বলে ছন্দোময়; গানে পরিণত হওয়ার ফলে এই ছন্দোময়তার তীব্রতা গভীরতা ও বৈচিত্র্য বেড়ে যায় (কবিতা গানে পরিণত হয়, অর্থাৎ কথা–ছন্দও সুর-ছন্দে বা স্বরছন্দে পরিণত হয়।)

৪. গদ্যে লেখা সাধারণ নাটকেও ছন্দ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না। অমিত্র বা মিত্র পয়ারে লিখিত নাটকে ছন্দ ঈষৎ ব্যক্ত। মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্তে রচিত হলে তা আরো ব্যক্ত বিচিত্র ও মুখ্য হয়ে পড়ে। এবং যখন তা গানে পরিণত হয়– সেই মুহূর্তে ছন্দের বেগ, তীব্রতা, মাধুরী- সবই বহুগুণে বেড়ে যায়।

বস্তুতঃ গীতিনাট্যের একটি অঙ্গ ছন্দোময় হয়ে উঠেছে– তা হচ্ছে গানের দিক, যদিও তা অভিনয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এক কথায়, গানের ছন্দ অভিনয়ের ছন্দ দ্বারা বিধৃত। রবীন্দ্রনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন– **'গীতিনাট্য যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয়, তাহাতে স্থানবিশেষ তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হয় না।'** এখানে স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গীতিনাট্যের প্রকৃতির মধ্যেই রয়েছে একটা। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া সমজাতীয় রচনা। প্রতি ও প্রকরণের দিক থেকে বিশেষ পার্থক্য নেই। এই দুখানি গীতিনাট্যে, একই প্রেরণা থেকে কথা ও সুরের আবির্ভাব ঘটে নি। অর্থাৎ কাব্যচেতনা ও সঙ্গীতচেতনা ও দুখানি গীতিনাট্যে সাযুজ্যলাভ করেনি। মায়ার খেলা এ দিক থেকে স্বতন্ত্র। এই গীতিনাট্যের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কথা ও সুর একই প্রেরণা সঞ্জাত। সুস্পষ্টভাবেই

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীয়মান হয় যে কবির ছন্দচেতনা শুধু যে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নয়, তা পরিপূর্ণ মিলনের জন্যেও প্রতীক্ষা করেছে। এরই রূপান্তর ঘটেছে নৃত্যনাট্যে– যেখানে অভিনয় পর্যন্ত (অর্থাৎ নৃত্য, কবির কথায় 'অঙ্গভঙ্গীর কবিতা' ছন্দোময় হয়ে উঠেছে। অঙ্গভঙ্গীর ছন্দ যখন রসের ধারক বাহক ও প্রকাশক হয় তখনই তাকে বলি নৃত্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা নৃত্যনাট্য

ভারতীয় ধ্রপদী নৃত্যের যে কটি মূলধারা, রবীন্দ্রনৃত্যধারা সে অর্থে কোনো ধ্রুপদী নৃত্যধারা নয়। বরং রবীন্দ্রনৃত্যধারাকে বলা যেতে পারে বিভিন্ন ধ্রপদী নৃত্যধারার এক পূর্ণাঙ্গ এবং মিলিত সমন্বয়। নৃত্য সম্বন্ধে কবিকে আমরা ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠতে দেখি, ১৮৮৮ সালে মায়ার খেলা গীতিনাট্য রচনার পর থেকে ১৯৩৫ সালে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য রচনার পরবর্তী সময়টুকুতে। এই সময়ের রচিত কাব্যগ্রন্থ কড়ি ও কোমল, চিত্রা, গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য, খেলা, বলাকা ইত্যাদি কাব্যের অনেক কবিতায় কবিমনের নিরুদ্দেশ যাত্রার আভাস পাই। এ হলো সীমা থেকে অসীমের যাত্রা। এই যাত্রা গতিময়তার প্রকাশ। গতিশীল জীবন বোধের প্রেরণায় বন্ধনমুক্তির অদম্য বাসনা এই কাব্যগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের এই যে অনাড়ম্বর আটপৌরে মানস উল্লাস অর্থাৎ বন্ধনমুক্তির আনন্দ তা বস্তুত চিত্রধর্মী। এই কবিচেতনা অবশেষে চিত্রময় বা রূপময় জগতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই জগত নৃত্যালোকের জগত। যে জগতের মূল চেতনা চিত্রগীতি ছন্দোবোধ। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে ছন্দ অবিরত বেজে চলেছে। যার একটুখানি পতনেই সৃষ্টির প্রলয়। সেই মহাকালের ছন্দবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনৃত্যভাবনার নেপথ্যের মূল সুর। এই দুই এর মিলনে যে ছন্দে মহাকালের মন্দিরা ডাইনে বাঁয়ে সদাই বেজে চলেছে তাতে যে নৃত্যের গতি, প্রকৃতিতেও সেই নৃত্যের ছন্দ। জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ, জোয়ার-ভাটা এ সবই সেই মহাকালের নৃত্যছন্দের এপার-ওপার। সেই বিশ্বছন্দের সাথে তাল মেলানোই কবির নৃত্য ছন্দের মূল সূর এবং সাধনা। গীতবিতানের বিচিত্র পর্যায়ের প্রথম সাতটি গান কবির নৃত্য ভাবনার প্রতিফলন।

১. আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো
২. নৃত্যের তালে তালে
৩. নাই ভয় নাই ভয় নাই রে
৪. প্রলয় নাচন নাচলে
৫. দুই হাতে কালের মন্দিরা
৬. মম চিত্তে নিতি নৃত্যে
৭. আমার ঘুর লেগেছে

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের নৃত্য ভাবনার নায়ক নটরাজ। তাকেই তিনি নর্তকের রূপকল্প হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন,

'নটরাজের তান্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোকে আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখন্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।'

নৃত্যের সংজ্ঞা কবি দিয়েছেন এভাবে, **'আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, তাকে চালনা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে জীবিকার প্রয়োজনে নয়- সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য'।**

আরেক জায়গায় বলেছেন, **'আমি সেই বিচিত্রের দূত। নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি, ছবি আঁকি, যে আসি; বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর আমি তাঁরই দূত। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরের গানে নৃত্যে চিত্রে বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে সুখে দুঃখের আঘাতে সংঘাতে ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে তাঁর বিচিত্র রসের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি। এই আশ্রমের নীলাকাশ উদয়াস্তর প্রাঙ্গণে এই সুকুমার বালক বালিকাদের লীলাসহচর হতে চেয়েছিলেন। লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ আমার সার্থকতা।'**

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই শান্তিনিকেতনের পাঠক্রমে নৃত্যকে অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার খানিকটা সূত্র পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের যে নৃত্যধারা সে কেবল নৃত্যশিল্পী তৈরি করার উদ্দেশ্যে নয়। পরিপূর্ণ শিক্ষার অংশ হিসেবে কবি জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে সংগীত, অভিনয় ও চিত্রকলার মত নৃত্যকে সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন রুচিশীল ধ্রুপদী ও দেশীয় নৃত্যকলার সমন্বয়ে একটি মান সম্পন্ন নৃত্যধারার চর্চা যা আধুনিক সমাজের একটি সংস্কৃতি মনস্ক মন তৈরী করবে এবং নব্যভারতীয় নৃত্যধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। যদিও সেটা সহসাই সম্পন্ন হয়নি। মনে রাখা দরকার যে তার নৃত্যভাবনা সম্পূর্ণ ভাবে শান্তি নিকেতন আশ্রমের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। নেপথ্যে ছিল

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশে এবং দেশের বিভিন্ন প্রদেশে, প্রচলিত নৃত্য পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা আর বিশ্বজগত আর জীবনস্বরূপ যে লীলায়িত নটরাজের নৃত্যছন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারই প্রতিফলন।

নৃত্যনাট্য উদ্ভবের প্রাচীনকথা

বিশ্বজগতের মধ্যে নিরন্তর গতির চাঞ্চল্য ও আবেগ আত্মপ্রকাশ করে নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র ছন্দে। প্রকৃতি তার বৃক্ষ-ফুল-ফলের সৃষ্টি ও পরিনতিতে ষড়ঋতুর আবর্তনে, এই গতিছন্দকে রূপায়িত করে প্রতি মুহূর্তে নানাভাবে। বিশ্বের এই গতিছন্দই প্রানিজগতে নৃত্যের মূল প্রেরণা। ভাষাহীন পশু এই ছন্দকেই অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করে তার নানা ভঙ্গির লাফ-ঝাঁপ-দৌড়, পাখি তর বিচিত্র লেজ দোলানো নাচে নব নব ভঙ্গিতে আকাশে উড়বার চেষ্টায়। মানুষও যে গতিভঙ্গি দেখেছে পশুপাখীর দেহ বিক্ষেপের মধ্যে যে ছন্দ দেখেছে সৃষ্টির অগ্রগতির মধ্যে তারই অনুকরণ করে প্রথম নৃত্যের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গতির দোলার মধ্য দিয়েই সে তার আনন্দ-বেদনা, বিরাগ-অনুরাগকে প্রকাশ করবার পথ খুজেঁ। সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে নৃত্যই ছিল তার ভাব প্রকাশের বাহন। নৃত্যই তার আত্মপ্রকাশের, তার শিল্পপ্রেরণার প্রথম স্তর।

তারপর যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে নৃত্য-উদ্ভব হয়েছে নতুন নতুন আঙ্গিকের তার ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। বাস্তবিক কোথাও সামাজিক অনুষ্ঠানের কর্তব্য হিসেবে, কোথাও ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে, কোথাও ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আনন্দ ও দুঃখ প্রকাশের বাহন হিসেবে নৃত্য জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে যায়।

বহু প্রাচীন কাল থেকে নৃত্যকলা ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে। দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং নৃত্য করতেন বলে উল্লেখ আছে। দেবসভায় উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচি প্রভৃতি অপ্সরারা বিখ্যাত নর্তকী বলে খ্যাতি সম্পন্না ছিলেন। কাব্য-পুরানাদিতে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ মূর্তি শিল্পে অনেক নৃত্যপরা দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। দেবর্ষি নারদ স্বর্গে বীণা বাজিয়ে নৃত্য করতেন।

মহাদেবের নৃত্য পরিকল্পনা ভারতীয় কাব্য ও শিল্প প্রতিভার চরম দান। মহাদেবই নৃত্যাভিনয়ের আদিগুরু বলে কল্পিত, তই তাঁর নাম নটরাজ। নটরাজ মহদেবের নৃত্যপর মূর্তি দাক্ষিনাত্যের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের অণু-পরমাণু হতে আরম্ভ করে জড়জগৎ ও প্রানিজগতের মধ্যে আত্মসংরক্ষণ ও বিলয়ের একটা প্রবল ঝড় অনুক্ষণ ধ্বংস হতে সৃষ্টিতে বিরামহীন সঞ্চরণ করছে। বিশ্বের মধ্যে চলছে বিরামহীন পরিবর্তন, বিশ্বসৃষ্টির এই ক্রমাগত পরিবর্তনের উদ্ভব হয়েছে নটরাজের নৃত্যেরই ফলে। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে এই তান্ডব নৃত্য চলছে। সৃষ্টির গতিশীল বৈচিত্র্যই তার নৃত্যের রূপ।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি ও ধ্বংসকে শিব তান্ডব নৃত্যের অঙ্গরূপে দেখেছিলেন- **".....যখন আদিদেবের আহ্বানে সৃষ্টি উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্যে আজও বিরাম পেল না, ষড়ঋতুর নৃত্য আজও চলছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক অন্ধকারের যুগল নৃত্য, নরলোকে অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর, সৃষ্টির আদিম ভাঙ্গাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যে ভাঙ্গাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী।"** (শ্রাবণগাথা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ২০ শ খন্ড, পৃ: ১১৯)

গোপিনীসহ কৃষ্ণের রাসনৃত্য, কালীয়াদমন নৃত্য, বাল গোপলের ননিচুরী নৃত্য প্রভৃতি আমাদের নিকট বিশেষ সুপরিচিত, বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞাদি ও ধর্মানুষ্ঠানে নৃত্যের প্রচলন ছিল। বেদে মন্ডল নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাব্রত-অনুষ্ঠানে জলপূর্ণ কলসী মাথায় করে বীণার তালে তালে এবং স্তোত্রগানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী লোকেরা আগুনের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করত এবং আগুনের উপর জল ঢেলে বৃষ্টি কামনা করত।

পুরাণাদি প্রায় সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেই নৃত্যের উল্লেখ আছে। দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে মানবের ঐহ্যিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সোপান বলে কথিত আছে। 'পদ্মপুরাণ'-এ কৃষ্ণভক্তের নৃত্যের শক্তি বর্ণিত আছে-

Dhaka University Institutional Repository

পদ্ভ্যাং ভূমে দিশো দৃগ্‌ভ্যাম
দোর্ভ্যাঞ্চা-ন্দলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্যতে রাজন্
কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ।।

কৌটিল্যের **'অর্থশাস্ত্র'**-এ দেখা যায়, সে যুগে রাজদরবারে নর্তকী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া সর্বসাধারনের আনন্দবর্ধনের জন্য পেশাদার নর্তকীরও উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ন তার **'কামসূত্র'** গ্রন্থে নৃত্যকে চৌষট্টি কলার অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। বৌদ্ধযুগে নৃত্যশিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। 'বিদ্যাবদনে'-এ রাজা রুদ্রায়ন বীণা বাজাতেন ও তাঁর পত্নী চন্দ্রাবতী নৃত্য করতেন বলে উল্লেখ আছে।

'মহাবংশ'-এ আছে সিংহল রাজা রাকেশ রাহু'র প্রথম রানী রূপবতী যেমন ছিলেন, সুন্দরী তেমনি ছিলেন নৃত্যে পটিয়সী।

অজন্তা, উলোরা, বাঘগুহা, কনারক-মন্দির প্রভৃতির প্রাচীর গাত্রে নৃত্যরত নারীর বহুচিত্র দেখা যায়। মন্দিরে দোসী নিয়েগ প্রথার মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের ব্যাপক প্রচলনের দৃষ্টান্ত মিলে। বিগ্রহের নৈবেদ্য, ভোগ, আরতি প্রভৃতি ছিল যেমন প্রাত্যহিক পূজার অঙ্গ, নৃত্যও সেইরূপ দৈনিক পূজার অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। এই নৃত্যের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মন্দিরেই স্থায়িভাবে নৃত্যকুশলা দেবদাসী নিযুক্ত করা হতো। এক সময় ভারতীয় নৃত্যকলা সমস্ত এশিয়া খন্ড ছেয়ে ফেলেছিল। বিখ্যাত চীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার রেল স্টেইন মধ্য-এশিয়ার মন্দিরগাত্রে নৃত্যরত মূর্তি অঙ্কিত দেখেছিলেন। ঐ সকল মূর্তিতে ভারতীয় নৃত্যকলার প্রভাব লক্ষিত হয়। এছাড়াও সারাভারতে নানাবিধ লোকনৃত্যের প্রচলন ছিল। রাজশেখরের প্রাকৃত নাটক কর্পূরমঞ্জরী'তে 'দন্ডরাস' নামে একপ্রকার নৃত্যের উল্লেখ আছে। এই নৃত্যে নর্তক-নর্তকী এক একটি ছেলে লাঠি হাতে নিয়ে বক্রাকারে নাচতে থাকে এবং প্রত্যেকবার পার্শ্ববর্তী নর্তক-নর্তকীর লাঠিতে আঘাত করে। এর অনুরূপ নৃত্য আমাদের বাংলার কাঠি নৃত্য।

Dhaka University Institutional Repository

খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতব্দী হতে ভারতীয় নৃত্যকলার বিশেষ অবনতি ঘটে । এর প্রধান কারণ মুসলমানী প্রভাব। মোগল বাদশাহদের যুগে ভারতীয় নৃত্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়-

ক) হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয় এবং

খ) দক্ষিণী বা দক্ষিণ ভারতীয়

হিন্দুস্থানী নৃত্যে আঙ্গিকের বিশেষ নৈপূণ্য থাকলেও তার ঘাড়ের ভঙ্গী, চোখের খেলা ও কোমরের দোলায় আদিম ইন্দ্রিয়াশক্তির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়। অবশ্য ভারতীয় নৃত্যেও গ্রীবাভঙ্গী, কটাক্ষক্ষেপ প্রভৃতি বিহিত, কিন্তু সেগুলি যেমন অতি-পরিমিত তেমনি সংযত এবং বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক হয়ে রসসৃষ্টির সহায়তা করে। হিন্দুস্থানী নৃত্যের উপর মুসলমানী প্রভাব পড়ায় ভারতীয় নিজস্ব রূপটির অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মুসলমান প্রভাব কম বলে ভারতীয় রূপটি তাতে অনেক পরিমাপে বজায় থেকেছে।

বাদশাহী আমলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের বহু পরিবর্তন ঘটায় নৃত্য ক্রমে ক্রমে সভ্যজীবনের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর ভারতীয় নৃত্যের চরম অবনতি ঘটে ইংরেজ আমলে এবং সভ্য ও শিক্ষিত জীবন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। থিয়েটার ও বাইজীর নাচের মধ্যে দক্ষিণী, মুসলমানী ও ইউরোপীয় নৃত্যের প্রভাব জগা-খিচুড়িরূপে বিরাজ করতে থাকে। অপরদিকে ভারতীয় নৃত্যের ক্ষীণ কঙ্কালটুকু শ্রীহীন রূপ ধারণ করে নানা লোকনৃত্যের মধ্যে বিশেষ করে বাংলায় রামায়ণ গান, জারি গান প্রভৃতির মধ্যে আত্মরক্ষা করতে থাকে।

ভারতের 'নাট্যশাস্ত্র' হতে আরম্ভ করে নন্দিকেশরের 'অভিনয়দর্পণ', 'নর্তননির্ণয়', 'নৃত্যবিলাস', 'নৃত্যসর্বস্ব', 'নৃত্যশাস্ত্র', অলোকমগ্ন বিরচিত 'নৃত্যাধ্যায়,' 'সংগীতনারায়ণ', সঙ্গীতদামোদর, প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রমাণিক গ্রন্থে ভারতীয় নৃত্যের একটা রূপ দেখতে পাওয়া যেতো। মল্লিনাথ 'কিরাতার্জুনীয়' নাটকের টীকায় 'নৃত্যবিলাস' ও 'নৃত্যসর্বস্ব' এর উল্লেখ করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

'সংগীতদামোদর'-এ নৃত্যকে বলা হয়েছে-

'.....তালমানরসাশ্রয়ঃ

সাবিলাসোহঙ্গবিক্ষেপা নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।'

তালমান ও রসযুক্ত এবং বিলাসপূর্ণ অঙ্গবিক্ষেপকে পণ্ডিতগণ নৃত্য বলে অভিহীত করতেন। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে নৃত্যকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হতো। যথা–

উদ্ধতং নৃত্যং তান্ডবং

সুকুমারন্তু লাস্যং

ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং।

ভারতীয় নৃত্যে কণ্ঠ-সংগীত ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। এই কণ্ঠ-সংগীত বিভিন্ন সুরের মোহিনী মায়ায় আমাদের অন্তরে বিস্তার করে। ভাষাতীত এক রস-সহস্যের জাল, এক অনির্বচনীয় অনির্দিষ্ট আনন্দ-বেদনায় আমাদের চিত্তকে করে তুলে চঞ্চল। নৃত্য সেই আনন্দ-বেদনাকে দেহের ছন্দের মধ্য দিয়ে অনির্বচনীয় রসরূপে সংবেদনশীল রসিক-চিত্তে সংক্রামিত করে। এটাই ভারতীয় নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা।

নন্দিকেশ্বর তাঁর **'অভিনয়দর্পণ'**-এ বলেছিলেন–

আস্যেনলম্বয়েদ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।

চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ।।

যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতোদৃষ্টিস্ততো মনঃ

যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ

এর অর্থ মুখ দিয়ে সংগীতকে গ্রহণ করতে হবে, অর্থাৎ প্রথমেই মুখ থেকে গান ধ্বনিত হয়ে উঠবে। গানের অর্থ হস্তসঞ্চালনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন মুদ্রাদির দ্বারা প্রকাশ করতে হবে। চোখ দিয়ে ভাব দেখতে হবে অর্থাৎ অন্তরস্থিত ভাবের প্রতিচ্ছবি চোখেই প্রতিফলিত হয়, তাই চোখের চাহনি দিয়ে সেই ভাবকে অভিব্যক্ত করতে হবে। পা দিয়ে তাল রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ নৃত্য ছাড়া ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ হয় না; গীত ও মুদ্রাদির সঙ্গে নৃত্যের প্রয়োজন। তাই নর্তক-নর্তকীর পদদ্বয় তালানুগত হয়ে নৃত্য প্রদর্শন করে।

পাশ্চাত্য নৃত্যে কণ্ঠ-সংগীতের একান্ত অভাব, সুতরাং এই নৃত্যের সঙ্গে সুরের অনির্বচনীয় ভাবলোক রচিত হয় না। নানা যন্ত্রের ছন্দ বহুল ধ্বনিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল পাশ্চাত্য নৃত্য। এর মূলভিত্তি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের তাল। খন্ড খন্ড নৃত্যের মধ্যে কোনো লোকোত্তর রস-ব্যঞ্জনা নেই। দীর্ঘায়ত ব্যালে (ballet) নৃত্যের মধ্যেও নানা যন্ত্রের বিচিত্র ধ্বনি ও তালের অক্ষুন্ন প্রভাব দেখা যায়।

পাশ্চাত্য নৃত্যের আদর্শ চোখ ও কানের তৃপ্তিসাধন-ইন্দ্রিয়জ-ভোগবর্ধন। ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ সূক্ষ্ম ভাবের রসপরিবেশণ দ্বারা প্রাণের তৃপ্তিসাধন। পাশ্চাত্যের ওয়ালস, কোয়াড্রিল, ল্যানসারস, পোলকা, পোলকা-মাজরুকা, ব্যালে, মিনেট প্রভৃতি নৃত্য নিঃসন্দেহে নিঁখুত ও অপূর্বকারুকার্যময় দেহ সঞ্চালনের দৃষ্টান্ত, কিন্তু তাদের অন্তরে প্রাণের প্রতিষ্ঠা নেই- দেহ সঞ্চালনকে কেন্দ্র করে মূলগত ভাবরসের কোনো ইঙ্গিত নেই। ভারতীয় নৃত্যশিল্প অন্তর্মূখী, পাশ্চাত্ত্য নৃত্যশিল্প বহির্মূখী।

পাশ্চাত্য নৃত্যকলার দূর্বলতা সম্বন্ধে সেদেশের শ্রেষ্ঠ কলাবিদগণ দিন দিন সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। নৃত্যের মধ্যে তারা দৈহিক ব্যায়ামের অনবদ্য কৌশলের উপরেও আরও কিছু চাইতেন। বিখ্যাত পাশ্চাত্য নর্তকী Isadora Duncan তাঁর আত্মজীবনীর একস্থানে লিখেছেন- "This method (পাশ্চাত্ত্য ব্যালে নৃত্যের প্রথা) produces an artificial mechanical movement not worthy of the soul". তাই তিনি ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ খোঁজছিলেন। তাঁর কথায়- "...the source of the spiritual expression to flow into the channels of the body filling it with vibrating light – the centifrugal force reflecting the spirit's vision." সুবিখ্যাত নর্তকী Anna Pavlova ও পাশ্চাত্য নৃত্যের প্রাণহীনতার কথা বহুবার বলে গেছেন। পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে তাঁর নৃত্যকলাও যে এক প্রকার যান্ত্রিক মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলো একথা বহু পাশ্চাত্য মনীষী অনুভব করে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যের বৈশিষ্ট্য

এখন রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্য বা শান্তিনিকেতনী নৃত্যের বৈশিষ্ট্য কি, দেখা যাক। রবীন্দ্রনৃত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত কয়টি উপাদান পাওয়া যায়–

(ক) নৃত্য সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের উৎকৃষ্ট অঙ্গ।

(খ) কবি রচিত সাহিত্য বা কাব্যই এই নৃত্যের মূল বিষয়বস্তু।

(গ) এই কাব্য-রচনার সাথে সুরযোজনা করায় প্রকৃত সংগীতের সৃষ্টি। এই সংগীতই রবীন্দ্রনাট্যের মূলভিত্তি।

(ঘ) সেই সংগীতের অন্তর্নিহিত ভাবকে নাচের অভিনয় দ্বারা দেহচ্ছন্দে ব্যঞ্জিত করে দর্শকের চিত্তে অনির্বচনীয় রসের উদ্বোধন।

রবীন্দ্রনৃত্য ও প্রাচীন নৃত্যের তুলনা

ক) নৃত্য মূলত ভারতীয় আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'অভিনয়দর্পণ'-এ বলা আছে, সংগীতের ভাবকে নৃত্যের তাল ও মুদ্রাদির কায়িক অভিনয়ের দ্বারা দর্শক মনে সঞ্চারিত করে রসের উদ্রেক করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যও অনেকটা তাই। এই নৃত্য গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ গানের উপর নির্ভর করে। গীতাভিনয়ের পরিপূর্ণতা নৃত্যাভিনয়।

কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতিকে কবি হুবহু গ্রহণ করেন নি, মূলত ঐ পদ্ধতির উপরেই তার নবসৃষ্টি নতুন রূপ ধরে আধুনিক কালের রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যে মুদ্রার ছিল একান্ত প্রাধান্য। প্রথমে মুদ্রা প্রদর্শন, তারপর নৃত্য। কিন্তু ঐ প্রাচীন মুদ্রার অর্থ বর্তমান যুগে সাধারণের নিকট সহজবোধ্য নয়, দুর্বোধ্য মুদ্রাভিনয় ব্যাঙ্গাভিনয়ে পরিণত হতে পারে। তাই তিনি মুদ্রাকে যথাসম্ভব ত্যাগ করেছেন। পূর্বে বলা হয়েছে দক্ষিণী নৃত্যের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের রূপ অনেকটা অবিকৃত আছে। বর্তমান কথাকলি-নৃত্যে মুদ্রার বিশেষ প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার নৃত্যনাট্যে-বিশেষ করে 'চণ্ডালিকা'য় কথাকলির আঙ্গিক অর্থাৎ ভঙ্গিমা ও তাল গ্রাহণ করলেও তার মুদ্রা অংশটি গ্রহণ করেননি।

গ) প্রাচীন নৃত্যে সংগীতের খুব একটা নিজস্ব পরিপূর্ণতা ছিল না; খন্ড খন্ড গানের সঙ্গে নৃত্য হত, এই ছিল প্রথা। বাদ্যের তালের উপর অনেকটা নির্ভর করেই সংগীতযুক্ত নৃত্য তার পূর্ণরূপটি প্রকাশ করত। কিন্তু রবীন্দ্রনৃত্যে সংগীতই হইল মূলভিত্তি, যার উপর নির্ভর করে সমস্ত নৃত্য প্রযোজনা গড়ে উঠছে। গানের কথা অনুসরণ করে সাহানা, ভৈরবী, বাগেশ্রী, পরজ, বাউল, কীর্তন প্রভৃতি বহু বিচিত্র সুরের ধারা বয়ে চলেছে, এই সব ধারা-সম্মিলনে নৃত্যনাট্য একটা বিরাট সুরের রূপ ধারণ করেছে। এর সহিত নানাবিধ তালের নৃত্য মিলিত হয়ে কথার ভাব-ব্যঞ্জনাকে আরও ফুটিয়ে তুলছে। সংগীত ও নৃত্য চলছে পাশাপাশি; একে অন্যের প্রকাশকে রুদ্ধ করে না। এই সুরের মধ্যে ও তালের মধ্যেও নানা সংমিশ্রণ আছে। মিশ্র সুর ও মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর সহযোগে রবীন্দ্রনৃত্য গড়ে উঠছে। এর কোনো বিশেষ নৃত্যপদ্ধতিকে আগাগোড়া অনুসরণ করেনি। মণিপুরী, কথাকলি, কথক, ভরতনাট্যম, লোকনৃত্য, ইউরোপীয় নৃত্য প্রভৃতির ভঙ্গী ও তাল কবি যেখানে যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছেন ততটুকুই গ্রহণ করেছিলেন এই নানা মিশ্রণের দ্বারা তাঁর ভাবকল্পনুযায়ী এক অভিনব নৃত্যপদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যচর্চা

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কবি সঙ্গীত, অভিনয় এবং চিত্রকলাকে শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নৃত্য শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ প্রথমাবস্থায় সৃষ্টি করতে না পারলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের জন্য যে সব নাটক বা ঋতুনাট্য রচনা করেছেন তাতে নিজেও নেচেছেন ছাত্রদেরও উৎসাহ দিয়েছেন নাচতে। বিশিষ্টজনদের স্মৃতিকথায় আমরা এ সম্বন্ধে জানতে পারি, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট অনুরাগী ভক্ত ডঃ কালিদাস নাগের স্মৃতিকথার জানতে পারি-

১৯১১ সালে কবির ৫০ বর্ষ পূর্তির উৎসবে তাঁর 'রাজা অভিনয় যখন আমি দেখি তখন তিনি শুধু সঙ্গীতের মাধুর্যে এবং অভিনয় নৈপূণ্যেই আমাদের মুগ্ধ করেননি। প্রত্যেকটি গীতাভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যব্যঞ্জনা যে জাগিয়েছিলেন সে কথা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে; ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন গানটি নাচের জন্যই রচিত; **'আজি দখিন দুয়ার খোলা'** কোরাস গাইবার সময় কবি এবং **'আমার সোনার হরিণ চাই'** গানে দীরেন্দ্রনথ গীতের মধ্যে নৃত্যের আভাস দিয়েছিলেন। তারপর অচলায়তন (১৯১২) অভিনয়ে অপাংক্তেয় শোণপাংশুরা, ভরতমুনির উপযুক্ত পুত্রদের মতোই পায়ে পায়ে নৃত্যভাষ্য রচনা শুরু করে কবির শিক্ষারই ফলে। পরলোকগত বন্ধু উইলি পিয়ারসন ১৯১৩-১৪ সালে পাশ্চাত্য ছাঁদের নৃত্য অচলায়তনের মধ্যে অবাধে চালিয়ে দেন কবির 'অভয় লাভ করে', সেটাও দেখেছি। ১৯১৬ সালে পিয়ারসন ফাল্গুনীর মধ্যেও নেচেছিলেন; এবং সেই সুপ্রসিদ্ধ অভিনয়েই কবি নিজে প্রকাশ্যে প্রথম নাচের কবিশেখরের অপূর্ব ভূমিকায়,

'চলিগো চলি গো,'

'আমায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়'

প্রভৃতি গানের অভিব্যক্তি তিনি নতুন মাধুর্য্যে সার্থক করেন।'

১৯১১ সালে ছাত্র ও শিক্ষকেরা মিলে যখন রাজা অভিনয় করেন তখন কলকাতার অনেকেই এসেছিলেন। এদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতা দেবীর স্মৃতিকথায় জানতে পারি।

Dhaka University Institutional Repository

'ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যবর্তী ঠাকুরদা রূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়ে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতি সুন্দর নৃত্য করিতে পারেন।'

১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনে এবং পরের বছর কলকাতায় ফাল্গুনী নাটকের অভিনয় হয়। এর গানের সঙ্গে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ খুবই দক্ষতার সঙ্গে নেচেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসুর আঁকা দুটি ছবিতে সেই নাচের পরিচয় অমর হয়ে আছে। শান্তিদেব ঘোষের স্মৃতিচারণায় জানতে পারি ১৯১৯ সালের পূজার ছুটির আগে শারদোৎসব নাটকে প্রথম ছেলেরা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশনায় সারিবেঁধে গানের ছন্দে মিলিত পদক্ষেপে মঞ্চপরিকল্পনা করে। তাদের হাতে ছিল শিউলী ও কাশফুলের ডালা।

'আমার নয়ন ভুলানো এলে,

'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ'

প্রভৃতি গানের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে মঞ্চ প্রদক্ষিণের পরিচালক ছিলেন কবি স্বয়ং।

নাটক এবং ঋতুনাট্যে আঙ্গিকাভিনয়ের রীতিতে কবির নিজের নৃত্য এবং নৃত্য পরিচালনার উৎস ছিল কবির প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা। ১৭ বছর বয়সে কবি প্রথম বিলেতে যান এবং ছিলেন প্রায় দেড় বছর। এই সময় বেশ কিছু বিলেতি সামাজিক নাচ শেখার সুযোগ তার হয়েছিল। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে কোনো ধ্রুপদী নৃত্যপদ্ধতি চর্চা শুরু হবার পূর্বে কবি তার এই বিলেতী নৃত্যের অভিজ্ঞতাকেই আঙ্গিকাভিনয়ের রীতিতে, ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে, লীলায়িত দেহভঙ্গিমায়, নৃত্যের আভাস রচনার কাজে লাগিয়েছিলেন। তার নিজের লেখনিতে জানতে পারি।

'গত মঙ্গলবার আমরা ওমুকের বাড়ীতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। নাচ আরম্ভ হল।... আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড় মিলে মিশে নাচতে পারিনে, প্রতিপদে ভুল হয়।... যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচতে আমার মন্দ লাগে না। মিস অমুকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল, আর তাকে বেশ দেখতে, তার সঙ্গে আমি নেচেছিলুম, তাই জন্যে তাতে আমার ভুল হয়নি। কিন্তু মিস অমুকের সঙ্গে আমি **lancer** নেচেছিলুম, তার সঙ্গে আমার

Dhaka University Institutional Repository

আলাপ ছিল না। আর তাকে অতি বিশ্রী দেখতে। তার সঙ্গে নাচতে গিয়ে যতপ্রকার দোষ হওয়া সম্ভব ঘটেছিল। নাচ ফুরিয়ে গেলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।'

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জীবনে কবি এই বিলেতী নাচের আঙ্গিকেই নিজের মত নূতন নাচ তৈরী করে নিজে নাচতেন এবং আশ্রম বালকেরা কবির এই নাচ অনুকরণ করে নাচার চেষ্টা করতো। এ কথা আমরা শান্তিদেব ঘোষের লেখায় জানতে পারি।

শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চার শুরু

শান্তিনিকেতনে যথার্থ অর্থে পদ্ধতিগত নৃত্যশিক্ষার শুরু হয় ১৯১৯ সালের মাঘ মাসে বুদ্ধিমন্ত্র সিং নামে আগরতলা থেকে আসা এক মণিপুরী নৃত্য শিক্ষকের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে যখন সিলেট ভ্রমণে যান তখন তাকে দেখাবার জন্য মণিপুরী নাচের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই নাচ দেখে মুগ্ধ হন এবং সম্ভবত শান্তিনিকেতনে নৃত্যচর্চার সম্ভাবনা ও সার্থকতা খুঁজে পান। তিনি চেয়েছিলেন সেখান থেকেই কোনো মনিপুরী নৃত্যশিক্ষক শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে কিন্তু কোনো কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ফেরার পথে তিনি আগরতলা হয়ে ফেরেন এবং সেখানেও মণিপুরী নাচ দেখেন। রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ এবং উৎসাহে ত্রিপুরার মহারাজা বুদ্ধিমন্ত্র সিংহ নামে একজন মণিপুরী নর্তক এবং একজন মৃদঙ্গবাদক শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন। শান্তি দেব ঘোষ লিখেছেন ,

'ছেলেদের কাছে তখন তা ছিল একাধারে শরীরচর্চা ও নাচ। নৃত্যচর্চার প্রথমদিকে অনুশীলনের সময় চারিদিকে একটা গণ্ডির সীমানা দেয়া হত যাতে শিক্ষার্থীরা তার বাইরে চলে না যায় এবং পিঠের সঙ্গে কাঠি বেঁধে দেয়া হত যাতে তাদের শিরদাঁড়া সোজা থাকে; গুরুদের নিজে প্রায়শই বিকেলে সে প্রশিক্ষণ দেখতে আসতেন। তিনি তখন থাকতেন দেহলী বাড়ীতে।'

যেটা লক্ষণীয়, এই নাচ শেখার ব্যাপারটি বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কায় শান্তিনিকেতন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এভাবে,

Dhaka University Institutional Repository

'ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুরের দরবার হইতে দুইজন কলাবিদ আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রম বালকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে মৃদঙ্গ সহযোগে সাঙ্গীতিক ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে।'

সংবাদে কোথাও নৃত্য বা নাচ শব্দটির উল্লেখ নেই। বুদ্ধিমন্ত্র সিংহ সেবারে কিছুদিন পরে গরমের ছুটিতে ফিরে গিয়ে আর আসেন নি। ছাত্রদের নৃত্যশিক্ষার সেখানেই সমাপ্তি ঘটে। তবে শান্তিনিকেতনে সেই প্রথম কোন ধ্রুপদী নৃত্যের চর্চার শুরু। মেয়েরা সে নৃত্যশিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি, সেটি ছিল কেবলমাত্র ছাত্রদের জন্য।

১৯২৩ সালে কবি সুরাট ও গুজরাট ভ্রমণ করেন। সুরাটের এক গ্রামে মেয়েদের মাটিতে বসা অবস্থায় ঢোলের তালে দুই হাতে দুই জোড়া মন্দিরা নিয়ে ছন্দতোলা এক ধরনের নাচ দেখে কবি খুবই মুগ্ধ হন। ভ্রমণ শেষে শান্তিনিকেতনে ফেরার সময় সেখানকার মন্দিরা নৃত্যকুশলী একটি পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। তাদের একটি কিশোরী কন্যা দুই হাতে মন্দিরা নিয়ে খুব সুন্দর নাচত। কবির ইচ্ছে ছিল সেই ধরনের নাচ শান্তিনিকেতনে মেয়েরা শিখে নিক। সবাইকে দেখাবার জন্য চৈত্র মাসের শেষে আম্রকুঞ্জে মেয়েটির নাচের আসর বসে। শান্তিনিকেতনের সবাই সেই নৃত্য দেখে মুগ্ধ। এ নাচটি শিখে নেবার জন্য একটি ছাত্রীদলকে নির্বাচন করা হয়েছিল। ছাত্ররা তাতে স্থান পায়নি। শিক্ষা চলেছিল কিছুদিন। তারপর পরিবারটি ফিরে যায়। এই নাচটি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি রচনা করেছিলেন **'দুই হাতে কালের মন্দিরা'** গানটি। মন্দিরা নৃত্য শিক্ষার সেখানেই ইতি হয়।

১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে ইংরেজী বিভাগে জাহাঙ্গীর ওয়াকিল অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তার পত্নী কাথিয়াওয়াড় এবং গুটরাজের গরবা লোকনৃত্য পটু ছিলেন। এই নাচটি মূলত মেয়েদের নাচ। চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে কখনো হাতে তালি দিয়ে কখনো দুহাতে দুটি দণ্ড নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে তালে তালে ঠোকাঠুকি করে নাচা হয়। প্রতিমা দেবী এবং রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে মিসেস ওয়াকিল বাছাই করা ১৫/১৬ জন মেয়েকে গরবা নাচের প্রশিক্ষণ দেন। এই দম্পতি প্রায় দু বছর শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মেয়েরা মোটামুটি গরবা নাচে পটুত্ব লাভ করেছিল। শান্তিদেব ঘোষ জানিয়েছিলেন,

'যদি বারণ করো গাহিব না'

Dhaka University Institutional Repository

'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'

'দুই হাতে কালের মন্দিরা'

প্রভৃতির গানের সঙ্গে গরবা নাচের আদর্শে নৃত্যসংযোজন করা হয়েছিল।

১৯২৫ সালে বসন্ত ও বর্ষা ঋতুর কিছু গানের সমাবেশে যথাক্রমে সুন্দর ও শেষবর্ষণ ঋতুনাট্য রচিত হয়। ছন্দময় দেহভঙ্গিমায়, মূকাভিনয় এবং গুজরাটের লোকনৃত্যের আদলেই তা করা হয়েছিল। এর পেছনে মূল প্রেরণা ছিল প্রতিমা দেবী এবং মিসেস ওয়াকিল। শেষবর্ষণ ঋতুনাট্যে নৃত্যের প্রয়োগের যথার্থতা উপলব্ধি করেই কবি মেয়েদের মধ্যে নৃত্যচর্চা শুরু করার কথা ভাবেন এবং ত্রিপুরারাজকে আবার মেয়েদের নৃত্যশিক্ষা দেবার উপযুক্ত আরেকজন মণিপুরী শিক্ষককে পাঠানোর অনুরোধ জানান। ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে নবকুমার সিংহ এবং তার ভাই বৈকুণ্ঠনাথ সিংহ শান্তিনিকেতনে আসেন। বাছাই করা মেয়েরা এর কাছে নিয়মিত নাচ শিখতে শুরু করে। এদের মধ্যে ছিলেন গৌরি দেবী, শ্রীমতি দেবী, নন্দিতা দেবী, অমিতা দেবী, যমুনা দেবী প্রমুখ। নাচ শেখানো হতো শান্তিনিকেতনবাসীর দৃষ্টির আড়ালে বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কায়। ক্লাসটির তত্ত্বাবধান করতেন প্রতিমা দেবী। এই সময় গভর্নর লর্ড লিটন কবির সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনিকেতন আসেন। তার অভ্যর্থনার জন্য নবকুমারের শেখানো একটি মণিপুরী রাসের নাচ দিয়ে অনুষ্ঠান সাজানো হয়। অনুষ্ঠানের কদিন আগে রবীন্দ্রনাথ এবং কয়েকজন বয়স্ক অধ্যাপক কোণার্ক বাড়িতে বসে আগে দেখে নেন অনুষ্ঠানটি।

মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক নবকুমার সিংহ চলে যাবার পর ১৯২৯ সালে মণিপুরের ইম্ফল শহর থেকে দুজন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক আসেন এবং ছেলেরা প্রবল উৎসাহে তার কাছে নাচ শিখতে শুরু করে। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষও মণিপুরী নৃত্যচর্চা শুরু করেন। এরা মাত্র বছরখানেক শান্তি নিকেতন ছিলেন।

১৯৩২ সালে রুশ দেশীয় লোকনৃত্য পটু এক মার্কিন দম্পতি বছরখানেকের জন্য শান্তি নিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। ডাঃ টিথার্স ও তার স্ত্রী রুশ দেশে কিছুকাল ছিলেন। সেখানে তারা সেদেশের কয়েক প্রকার লোকনৃত্য শিখেছিলেন। এই নাচে পায়ের ছন্দে আনন্দোচ্ছল

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গিমার ভাবটি সহজে শেখানো যায়। মাঘী পূর্ণিমার রাত্রের অনুষ্ঠানে শান্তিদেব এদের কাছে শেখা নৃত্যভঙ্গিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে নাচ তৈরি করেছিলেন রুশ দেশীয় নৃত্য ভঙ্গিতে।

কেরালার কোচিন রাজ্যের মহারাজা, কবির অনুরোধে কল্যাণী আম্মা নামে একজন নৃত্যশিক্ষিকাকে পাঠিয়ে দেন ১৯৩৪ এর জানুয়ারী মাসে। তিনি সম্ভবত মোহিনী অষ্টম নৃত্যের একজন জনপ্রিয় শিল্পী ছিলেন। ছাত্রীরা এর কাছে স্বরম, কইকুট্টিকলি ও কলাম্মুলি নামে কয়েকটি নাচ শিক্ষা করেন। তিনি অভিনয় নৃত্য শেখাতে পারেননি কারণ তার সাথে গায়ক ও বাদক ছিল না। এছাড়া নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানতেন না। কল্যাণী আম্মার শেখানো নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে কম্পোজিশান এর মধ্যে 'ওগো বধূ সুন্দরী' গানের সঙ্গে নাচকে খুব সুন্দর মেলানো হয়েছিল। গরমের ছুটিতে দেশে গিয়ে আর ফিরে আসেননি। এবারে কথাকলি নৃত্যের নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে কবি ভাস্কাখোর নারায়ণ মেনন প্রতিষ্ঠিত কোচিন রাজ্যের কথাকলি নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কেরালা কলামণ্ডলমে' যান তখন কেলু নায়ার সেখানকার তরুণ শিক্ষার্থী ছিলেন। পরে শান্তিদেবই তাকে নির্বাচন করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। কেলু নায়ার সে বছরই কেরালা কলামলন্ডলমের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপরই শান্তিনিকেতনে এবং রবীন্দ্র নৃত্যে কথাকলি নৃত্য একটি স্থায়ী আসন লাভ করে।

১৯২৫ সালে নবকুমার প্রথমবার শান্তিনিকেতনে আসেন। ১৯২৭ সালে তিনি আহমেদাবাদে চলে যান এবং ১৯৩৫ সালে বম্বেতে মণিপুরী নৃত্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে যান। এর মধ্যে প্রয়োজনে খবর পাঠিয়ে তাকে শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময়ে আনানো হয়েছে বিশেষ করের অনুষ্ঠানের সময়। ১৯৩৪ এর মার্চে নবকুমার সিংহ আবার আসেন। সঙ্গে ছিলেন তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র নরেন্দ্র সিংহ। পরের বার নবকুমার মণিপুরী নৃত্যের আরেকটি নতুন দিক শান্তি নিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উন্মুক্ত করলেন যা পূর্বে করেননি। বিশুদ্ধ মণিপুরী নৃত্যভঙ্গিতে কবির গানের কলির ফাঁকে ফাঁকে অনুকূল ছন্দের বোলের নাচ ঢুকিয়েছিলেন। এতে নাচে যেমন বৈচিত্র্য এসেছিল তেমনি জমজমাট লাগতো। বাকি আমি রাখবো না, কেন পান্থ এ চঞ্চলতা প্রভৃতি গানের সাথে এই আদর্শে নৃত্য সংযোজন করা হয়। এটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনৃত্যধারার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নবকুমার যখন তার কর্মস্থলে ফিরে যান তারপর শিলচর থেকে ১৯৩৪ এর জুলাই মাসে রাজকুমার সেনারিক সিংহ এবং মৃদঙ্গ বাদক মহিম সিংহকে নিয়ে আসা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। সেনারিক সিংহ পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে দলের সঙ্গে মাদ্রাজ ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে যান। পরিবর্তে, শিলচর থেকে আসেন নীলেশ্বর মুখার্জি। তিনিও মণিপুরী। শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন,

> **'শিলচরের মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক শণি[illegible]্রী পঞ্চম তালের একটি সম্মেলক নৃত্য, খোলের বোলের সঙ্গে শিখিয়েছিলেন। ছন্দ ও ভঙ্গি বৈচিত্র্য নাচটি ছিল খুবই জমাট। গানের সঙ্গে নাচটিকে বেঁধে রাখবার প্রয়োজন গুরুদেব 'দূরের বন্ধ সুরের দূতীরে' গানটি রচনা করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে মাদ্রাজে শাপমোচনের অভিনয় কালে নাচের জন্য গানটিকে রাখা হয়।'**

রবীন্দ্রনৃত্যে বিভিন্ন নৃত্যধারার সমন্বয়

১৯২৭ সালে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ থেকে বাসুদেবন নামের একটি ছাত্র শান্তি নিকেতনে কলাভবনে ভর্তি হন। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে বাসুদেবন নৃত্য চর্চা করতেন। ভরতনাট্যমের কিছু ভঙ্গিকে পায়ের সহজ ছন্দে গেঁথে মনের আবেগ প্রকাশ করতেন। কিন্তু বিধিবদ্ধ ভরতনাট্যাম নয়। বলা যেতে পারে ভরতনাটমে নৃত্যভঙ্গির ভিত্তিতে আধুনিক নৃত্যের একটি ধারা। নন্দলাল বসুর আগ্রহে শান্তিনিকেতনবাসী সকলেই তার নাচ দেখে মুগ্ধ। কবি তখন আশ্রমে ছিলো না। ফিরে এসে বাসুদেবনের কথা শুনে তার নাচ দেখলেন এবং স্থির করলেন পরবর্তী অনুষ্ঠানে বাসুদেবনকে ব্যবহার করবেন। নটরাজ নাম পরিবর্তন করে যখন ঋতুরঙ্গ করা হলো তখন তাতে, প্রধান ভূমিকা ছিল বাসুদেবনের। বাসুদেবনের উল্লেখযোগ্য নৃত্য ছিল 'যেতে যেতে একলা পথে'। কোনোখানে তিনি একা নেচেছেন, কোনো গানে তার সঙ্গী ছিল ২/১টি ছাত্রী। বাসুদেবনের নাচে যে পুরুষোচিত বলিষ্ঠতা ছিল তা দেখে শান্তিনিকেতনের অনেক ছাত্রই নাচ শিখতে আগ্রহী হয়েছিল কিন্তু বাসুদেবনের নিজের ভরতনাট্যমের পদ্ধতিগত শিক্ষা না থাকায় তিনি ছেলেদের নাচ শেখাতে পারেননি বটে কিন্তু নৃত্যের প্রতি তাদের আগ্রহ তৈরী দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষের নৃত্যের প্রেরণাও তার কাছ থেকেই পাওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩১ এর জানুয়ারী মাসে শান্তিদেব কেঁদুলী জয়দেব মেলাতে যান। তিনি খিলেছেন, এই মেলায় আমার যাতায়াত পূর্বেও ছিল। সেখানে যখনি গেছি প্রতিবারই দু-একজন খুবই উঁচুদরের নাচিয়ে বাউলের দেখা পেয়েছি। তাদের নাচ ছিল বিধিবদ্ধ ছন্দে, তালে গঠিত। পায়ের ছন্দের কাজে নানা রকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করতাম। এঁদের নাচের পুরুষোচিত শক্তির বিকাশ আমাকে খুবই মুগ্ধ করতো। যদিও তাদের কাছে নাচ শিখিনি কিন্তু সেই নাচের প্রভাবে তাঁদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করতাম। এ বছরেও সেইরূপ একটি বাউলের দেখা পেলাম মেলাতে। একটু মনোযোগ দিয়েই এবার তার নাচ দেখি। ফিরে এসে পূর্বের এবং এবারের অভিজ্ঞতাকে গুরুদেবের বাউল সুরের গানের সঙ্গে রূপ দেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

একই সময়েই শান্তিদেব ঘোষ গুরুসদয় দত্তের আয়োজিত সিউড়ী লোকনৃত্যগীতের সম্মেলনে গিয়ে বীরভূমের রায়বেঁশে এবং ময়মনসিংহের মুসলিম সম্প্রদায়ের রুমাল হতে পুরুষের জারি নৃত্য দেখেন। সে বছর দোল উৎসবের সময় শান্তিদেব ঘোষ বাউল, রায়বেঁশে, জারি, মিলিয়ে নিজের কম্পোজিশনে নেচে সবার প্রশংসা পেয়েছিলেন। সন্ধ্যায় কবি নিজেও শান্তি দেবের নাচ দেখেন। দোলের কিছুদিন পরে কলকাতার নবীন অনুষ্ঠানে শান্তিদেবকে বাউলের নাচের ধরনে একতারা হাতে নাচতে নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে সিউড়ী থেকে রায়বেঁশে নাচের প্রশিক্ষণের জন্য কয়েকদিনের জন্য নাচিয়ে আনানো হয়। নবীন অনুষ্ঠানে এবেলা ডাক পড়েছে, ফাগুন হাওয়ায়, হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর, ইত্যাদি গানের সঙ্গে দেশীয় বাউল, রায়বেঁশে ও জারির আদর্শে নৃত্যসংযোজন করা হয়েছিল। এসময় কবি নিজে একতারা হাতে রাখার কয়েকটি ভঙ্গির নির্দেশ দেন এবং গানের কোন অংশে বসা বা ওঠা তার নির্দেশও দেন। সে বছরই গরমের ছুটির সময় আরো ভালো করে শিক্ষার উদ্দেশে শান্তিদেব ঘোষকে কোচিন শহরের কেরালা কলমণ্ডলমে কয়েক মাসের জন্য পাঠানো হয়। তিনি সেখানে থেকে কথাকলির কিছু নৃত্যভঙ্গি বিশেষত কলাসম, সারি প্রভৃতি তালের নাচ এবং হাতের অভিনয় মুদ্রা ও তার ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে শ্রীমতি দেবী (হাতি সিংহ) নামের শান্তিনিকেতনের এক প্রাক্তন ছাত্রী জার্মানীর Rubolt von Laban, Marry Wigman, Must Jass এর প্রবর্তিত ইউরোপীয় আধুনিক নৃত্য শিখে দেশে ফিরে আসেন। গুজরাটের এক ধনাঢ্য পরিবারের কন্যা শ্রীমতি শান্তিনিকেতনে

Dhaka University Institutional Repository

কলাভবনে ১৯২০ সালে যোগ দেন। ১৯২৭ এ জার্মানী গিয়ে ফিরে আসেন ১৯৩০ সালে। ১৯৩১ সালে মে মাসে দার্জিলিংয়ে কবি থাকাকালীন শ্রীমতি দেবী সেখানে অবস্থান করছিলেন। কবির বিদায় অভিশাপ আবৃত্তির সঙ্গে সেখানে একটি নাচের অনুষ্ঠানে শ্রীমতি নেচেছিলেন ইউরোপীয় আধুনিক নৃত্য, রবীন্দ্রনাথ সে নাচ অনুমোদন করেন। সে বছরই বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে শ্রীমতি দেবী আধুনিক ইউরোপীয় নৃত্যধারায় ঝুলন কবিতায় আবৃত্তির সঙ্গে এবং এস নীপবনে গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন। মেয়েদের দলবদ্ধ নৃত্য হয়েছিল মণিপুরী ঢং-এ। ঐ বুঝি কালবৈশাখী গানে কথাকলি, বাউল ও রায়বেঁশে নাচের অঙ্গভঙ্গি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জাভাবালি ভ্রমণ এবং সে দেশের নৃত্যের অভিজ্ঞতা কবিকে জাভাবালির নৃত্য সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলে এবং তিনি ইন্দোনেশিয়ার সুরকর্তা শহরে তামানশিষ্য বিদ্যালয়ে শান্তিদেব ঘোষকে জাভাবালির নৃত্য প্রশিক্ষণ নেবার জন্য পাঠান কয়েকমাসের জন্য। তামানশিষ্য বিদ্যালয়ের পরিচালক দেবান্তর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী ভক্ত। তিনি শান্তিদেবের নৃত্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন। শান্তিদেব ঘোষের প্রতিটি ভ্রমণের ফলে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারার নতুন কিছু না কিছু যুক্ত হয়েছে। প্রতিবার ভ্রমণ শেষে অভিজ্ঞতা এবং অর্জন রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে হয়েছে এবং পরে তা ঋতুনাট্যের খণ্ড গানে বা নৃত্যনাট্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় প্রতিমা দেবীর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু প্রতিমা দেবী নবকুমার সিংহের কাছে ১৯২৫/২৬ সালে কিছুদিন মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা করেন। এছাড়া কবির সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়ে ইংল্যান্ডের ডার্টিংটন হলে ব্যালে নৃত্যের রচনা কৌশল দেখেন এবং কিছুটা প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। কবির অধিকাংশ নৃত্যভিনয়ের পরিকল্পনাকারী হিসেবে প্রতিমা দেবীকে লক্ষ্য করি। নটীর পূজা থেকে শুরু করে চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, শাপমোচন, মায়ার খেলা, তাসের দেশ, সামান্য ক্ষতি ইত্যাদি কাহিনীকাব্যগুলোকে মুকাভিনয় বা নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে নতুন রূপ দেবার প্রথম পরিকল্পনা ছিল তার। নৃত্যের সাজ পোশাকও প্রতিমা দেবী নির্ধারণ করে দিতেন। নৃত্যোপোযোগী নাট্য এবং নৃত্যনাট্য রচনায় কবির নেপথ্যের মূল প্রেরণাদাত্রী ছিলেন প্রতিমা দেবী।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২৬ সালে কবির জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিমা দেবী পরিকল্পনা করেন যে, 'কথা ও কাহিনী' কাব্যের পূজারিনী কবিতা অবলম্বনে কেবলমাত্র ছাত্রীদের দিয়ে নবকুমারের সহযোগিতায় আবৃত্তি, গান ও মণিপুরী নাচ সহযোগ মুকাভিনয় করানো হবে। কবি সে কথা শুনে নিজেই কবিতাকে নাটকে রূপান্তরিত করে পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। গানের ভার ছিল দিনেন্দ্রনাথের ওপর আর নৃত্য পরিচালনা করলেন প্রতিমা দেবী ও নবকুমার সিংহ উভয়ে। নটীর পূজার শেষ গান 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' সম্পূর্ণভাবে নৃত্যের মাধ্যমে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের অন্যান্য গানেও নৃত্যের প্রয়োগ ছিল। এতদিন পর্যন্ত নাটকে নৃত্যের প্রচ্ছন্ন ভাব থাকতো। এই প্রথম গানের সঙ্গে সচেতন ভাবে নৃত্যকে মেলাবার চেষ্টা করা হলো। নটীর পূজায় নৃত্যকে নাটকের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাওয়া গেল। কারণ নৃত্যেরই অর্ঘ্যে নটী তার পূজা সমাপন করে। নটীর পূজার বিষয়বস্তুর সঙ্গে নৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ভৈরবী রাগিনীতে রচিত গানটির সঙ্গে আচার্য নন্দলালবসুর কন্যা গৌরি দেবীর মণিপুরী নৃত্য সহযোগে শ্রীমতির আত্মনিবেদনের ভঙ্গিমা সকল দর্শকের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করেছিল। নটীর পূজা কয়েকবারই অভিনীত হয়। ১৯৩১ সালে কবির ৭০তম জন্মদিনে কবি শ্রীমতির নাচ সম্পূর্ণ নতুনভাবে রচনা করতে নির্দেশ দিলেন। এবারে নাচের দায়িত্ব ছিল শান্তিদেব ঘোষের উপর। তিনি কথার ছন্দের সঙ্গে পদ ছন্দকে মিলিয়ে ছিলেন ভাবটি ঠিক রেখে। কবি দুরকম নাচই পাশপাশি দেখেন। মণিপুরীর সঙ্গে কথাকলি ও বাউলের নৃত্যছন্দের মিলন ঘটে। এই নতুন রচিত নৃত্যটি কবির সমর্থন পায় এবং কলকাতাতেও প্রশংসা লাভ করে।

বিভিন্ন ঋতুনাট্যে নৃত্যের প্রয়োগ

নটীর পূজার অভিনয় ও নৃত্যলীলা কবিচিত্তে সম্ভবত নতুন ভাবের উন্মেষ ঘটিয়েছিল। পরের বছর রচনা করলেন নটরাজ ও ঋতুরঙ্গ। এই দুটি ঋতুনাট্যে কবির নৃত্যচেতনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নৃত্য ও গীতের সাধনায় মুগ্ধ কবি স্তব করলেন নৃত্যদেবতা নটরাজের। লিখছেন,

'নৃত্যের তালে তালে, হে নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে

Dhaka University Institutional Repository

সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও

মুক্ত সুরের ছন্দ।

....

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ

নৃত্যে তোমার মায়া

বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে

কাপে নৃত্যের ছায়া'।

এখানে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন,

'প্রভু এই আমার বন্দনা

নৃত্যে গানে অর্পিব চরণতলে,

তুমি মোর গুরু'।

এই অনুষ্ঠানের গান, কবিতা ও নাচের দ্বারা তিনি উচ্চাঙ্গের শিল্পকলা হিসেবে নৃত্যকে যে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন তা পরিস্কার দেশবাসীকে জানিয়ে দেন।

এই সময় থেকেই নৃত্যের প্রয়োজনে কবি গীত রচনা করেছেন, ছন্দবদল করেছেন। নাচের ছন্দ ও ভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে গানের ওপর নির্ভর করে গঠিত। আলাদা করে তালের ছন্দ দেখাবার রেওয়াজ তখনো শুরু হয়নি। এই দুটি ঋতুনাট্যে মণিপুরী নৃত্যধারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলো। একক নৃত্যই ছিল বেশি। কয়েকটি সম্মেলক নৃত্য ছিল। ১৯২৭ সালে ঋতুরঙ্গ থেকে ১৯৩১ সনে নবীন রচনার আগ পর্যন্ত শান্তি নিকেতনের যে বিশেষ নৃত্যধারা তা মণিপুরী আদর্শে চালিত হলেও পুরোপুরি মণিপুরীর অনুসরণ নয়। মেয়েরাই মূলত একক নুত্যে অংশগ্রহণ করতো। দলবদ্ধ নাচ থাকতো খুবই কম। এবং নাচ হতো গানের দলের সমবেত গানের সঙ্গে। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে বসন্ত উৎসবের জন্য কবি রচনা করেন নবীন। নবীনের অভিনয়ে ছেলেরা নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছিল। নবীনে মণিপুরী নাচের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বাউল, রায়বেঁশে ও রাঙ্গেরীয় লোকনৃত্য ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সব রকমের নৃত্যপদ্ধতি নানা গানে বেশ ভালোভাবেই খাপ খাওয়ানো হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও মিস ব্রুনার নামে হাঙ্গেরীয় একজন নৃত্যপটু ছাত্রী সে সময় শান্তি নিকেতনে ছিলেন ১৯৩১ সালে ভাদ্রমাসে কলকাতায় শিশুতীর্থ ও গীতোৎসব হয়। শিশুতীর্থের অভিনয়ের আগে গীতোৎসব নামে আলাদা নৃত্যগীতের আয়োজন ছিল। এতে নাচ ছিল নানা ধরনের। এতে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় প্রথম কথাকলি নৃত্যধারা পদ্ধতি সংযোজিত হলো শান্তিদেব ঘোষের তত্ত্বাবধানে। এছাড়া বাসুদেবন নাচল তার দেশীয় ঢং-এ। বিদেশী নৃত্যপদ্ধতিতে নাচলেন জার্মানী থেকে শিখে আসা শ্রীমতি দেবী। হাঙ্গেরীয় শিল্পী নাচলেন তার দেশের সঙ্গে গুরুদেবের গানের সঙ্গে। এবাবে বিনা গানে কেবল তালো বোলের সঙ্গে দু' একটি নাচ দেখানো হয়েছিল তার মধ্যে কথাকলির নাম উল্লেখ করা চলে তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কবির কণ্ঠে তার আবৃত্তির সঙ্গে নাচ। ভারতীয় নৃত্যধারায় এটি নিঃসন্দেহে নবতম সংযোজন। এর মধ্যে ঝুলন ও দুঃসময় সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। ঝুলনের নৃত্য পদ্ধতি ছিল আধুনিক ইউরোপীয় নৃত্যপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে। নেচেছিলেন শ্রীমতি দেবী। তার দুঃসময় ছিল মণিপুরী নৃত্যাঙ্গিকে, নেচেছিলেন হৈমন্তী দেবী।

এবছরই এরপর কবি শিশুতীর্থ রচনায় হাত দিলেন। শিশুতীর্থকে কবি বলেছেন কথিকা। শিশুতীর্থ পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে যেভাবে আছে অভিনয়ের কারণে তার কিছু পরিবর্তন আনা হয়। নাটকটির উদ্বোধন বাক্য ছাড়া দশটি সর্গে বিভক্ত। এই নাটকের প্রতিটি সর্গ কবি মঞ্চের পাশে বসে আবৃত্তি করেছিলেন এবং প্রায় প্রতিটি সর্গের আবৃত্তির সঙ্গে সমিতি দেবী ইউরোপীয় আধুনিক নৃত্যের আঙ্গিকে নাচের দ্বারা সেই ভাবকে প্রকাশ করেছিলেন। শিশুতীর্থ রচনাপদ্ধতির সঙ্গে ব্যালে রচনা পদ্ধতির কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। ব্যালে রচনার ক্ষেত্রে মূল বিষয়বস্তুটিকে বিভিন্ন দৃশ্যে প্রথমে সাজিয়ে নেয়া হয় তারপর দৃশ্যানুযায়ী ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে নৃত্য, যন্ত্রসঙ্গীত ও দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পিত হয়। শিশুতীর্থ বাস্তবিক পক্ষে এই আদর্শেই রচিত। প্রথমে শুধুমাত্র প্রিন্ট রচনা করা হয়েছে পরে এক একটি সর্গের ভাব অনুযায়ী গানগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল ব্যালেতে নাচের ভিত্তি যন্ত্রসঙ্গীত আর শিশুতীর্থে নাচের ভিত্তি গান, আবৃত্তি ও কথা।

467409

এই বছরই ডিসেম্বর মাসে রচনা করলেন শাপমোচন। এটিও আগেরটির মতো একই পদ্ধতিতে রচিত। কেবল আরো বেশি নাটকীয়। একাধিক পাত্রপাত্রী এতে স্থান পেয়েছে। রাজা

Dhaka University Institutional Repository

নাটক অবলম্বনে কবি এই নৃত্যনাট্যটি রচনা করেন। নৃত্যাভিনয়ের জন্যই এটি লেখা। শিশুতীর্থ পর্যন্ত গানের জন্যই নৃত্যের অবতারনা। নৃত্য গানের অনুষঙ্গ মাত্র। শাপমোচনে লক্ষ্য করা যায় নৃত্যের প্রয়োজনে গানের প্রয়োগ। শাপমোচন বহুবার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনীত হয়। প্রতিবারই নৃত্যধারার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ রীতিতেও পরিবর্তন হয়। প্রতিবারই নৃত্যধারার উৎসর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ রীতিতেও পরিবর্তন আসে। মণিপুরী নাচের বোল দিয়েই তার সূত্রপাত। গানের মাঝে মাঝে ছোট খোলের বোল দিয়ে অভিনয় থেকে কেবল নাচের ছন্দে দর্শকের মনকে একটু আন্দোলিত করাই হল এর কাজ। এর সূত্রপাত করেন নবকুমার সিং যিনি নটীর পূজার যুগে মণিপুরী নাচ শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। শাপমোচনের জন্য তাকে আবার আনা হয়েছিল। এছাড়া কথাকলি এবং মালাবারের মেয়েদের একপ্রকার নাচও ছিল। শাপমোচনের দৃশ্যগুলো নানা ঘটনার সমাবেশে রচিত যেমন ইন্দ্রসভা, মর্তদৃশ্য, রাজা চলেছেন, বিবাহের আয়োজন ইত্যাদি। সবই নৃত্যের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

[শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে]

Dhaka University Institutional Repository

কবির বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় নৃত্য

নৃত্য সম্বন্ধে যে উৎসাহ ১৯২৪ সালের পর থেকে পরিলক্ষিত হয় তার পেছনে কবির বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার এক বড় ভুমিকা রয়েছে। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর ইউরোপ এবং আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের পরিচিতি বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তিনি পর পর কয়েকবারই ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভ্রমণে যান। এসব বিদেশ ভ্রমণে তার সম্মানার্থে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত সংগীত পরিবেশন করেছেন। রবি জীবনীকার প্রভাত কুমার পাল রবি জীবনীতে সে কথা জানিয়েছেন। বিদেশে দর্শকদের সম্মুখে বাংলা ভাষার গান এবং তার ভাবার্থ অনুবাদ করতে গিয়ে তিনি হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন যে, সঙ্গীতের ভাষার চাইতে চিত্রকলা এবং দেহের ভাষা বা নৃত্যের ভাষা অধিকতর বিশ্বজনীন। যে কারণে শেষ বয়সে কবি হাতে তুলে নিলেন রংতুলি। ঠিক একই কারণে তাকে নৃত্যের কথা ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। শিল্প সম্মত দেহের ভাষা অর্থাৎ নৃত্যের আবেদন তুলনামুলকভাবে সহজ ও সুদূরপ্রসারী একথা সম্ভবতঃ ইউরোপ ভ্রমণের সময়ই তার মনে আসে।

১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত কবি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং জাপান, চীন ভ্রমণ করেন। জাপানে কবির মনে নৃত্য সম্বন্ধে যে নিবিড় আগ্রহ ও অনুরাগ জন্মেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় জাপানী যাত্রী গ্রন্থের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে। এই সব উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কবি নৃত্য সম্বন্ধে নতুন করে ভাবছিলেন। তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে ছন্দোময়তার চিন্তা। জাপানে তিনি যে নৃত্যাভিনয় দেখেছেন তা তিনি স্বীকার করেছেন। অনুমান করা যায় নৃত্যাভিনয় বলতে তিনি নো ও কাবুকীর নৃত্যভিনয়ের কথাই বলেছেন। জাপানী নৃত্যাভিনয় সম্বন্ধে কবি এক জায়গায় বলেছেন,

> 'জাপানের কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাট্যের অভিনয় দেখেছি; তাতে কথা আছে বটে কিন্তু তার ভাবভঙ্গি, চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরণে। বড় আশ্চর্য তার শক্তি।'

Dhaka University Institutional Repository

'নো' নৃত্যাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধীরগতি এবং নির্দিষ্ট ভঙ্গি। আমাদের কথাকলি নাচের মতো মুদ্রার ব্যবহার যদিও সেই তবুও সংকেত ধর্মিতা এতে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কয়েকটি মাত্র পদক্ষেপ যাত্রা শেষ নির্দেশ করে। হাঁটুতে আঘাত করলে উত্তেজনা প্রকাশ পায় ইত্যাদি। এতে মুখোশের ব্যবহার হয়। দুজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে একজন মুখোশ পরে। বারেবারে মুখোশ বদল করে সে বিভিন্ন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়। অপরজন দর্শকের মতো তার গতিবিধি লক্ষ্য করে। সবটুকুর মধ্যে একটা ঘরোয়া অথচ আভিজাত্যের ভাব ফুটে ওঠে। 'কাবুকী', 'নো' এরই আরেক পরিণতি। নো এর মতো কাবুকীতেও সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ব্যবহার হয়। কাবুকীতে মুখোশের ব্যবহার হয় না। তবে অভিনেতারা সারা মুখে বিচিত্র রং ও রেখা দিয়ে মুখোশের অনুকরণ করে। অনেকটা কথাকলি নৃত্যপদ্ধতির মতো। পিকিং এর নাট্যশালায় নৃত্যাভিনয় দেখেও কবির ভালো লেগেছিল।

জাপান চীন ভ্রমণের স্মৃতি ম্লান না হতেই ১৯২৭ সালের জুলাই আগষ্ট মাসে জাভা বালি দ্বীপ ভ্রমণে যান কবি। এই ভ্রমণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া নৃত্যানুরাগ। 'জাভা যাত্রীর পত্র' গ্রন্থে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কবি লক্ষ্য করেছেন জাভা ও বালি দ্বীপের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রয়েছে। সেখানকার নাট্যাভিনয়ে রামায়ণ ও মহাভারতের বিশেষ স্থান রয়েছে। নৃত্য এদের জীবনের সঙ্গে কতখানি জড়িত তা কবির একটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়।

> **'কাল যে ছবির অভিনয় দেখা গেল, তাও প্রধানত নাচ অর্থাৎ ছন্দোময় গতির ভাষা দিয়ে কথা বলা...। এদেশে নাচের মনোহারিকা ভোগ করার জন্যই নাচ নয়, নাচটা এদের ভাষা।... এদের গামেলানোর সঙ্গীতটাও সুরের নাচ।... এই সঙ্গীতটাও সঙ্গীতের জন্য নয় কোন একটা কাহিনীকে নৃত্যছন্দের অনুষঙ্গ দেবার জন্য।'**

জাভা ও বালি দ্বীপের নৃত্যনাট্য প্রায় কথাকলির মতো। জাপান ভ্রমণের অনুরূপ জাভা বালি দ্বীপে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কবির নৃত্যচেতনাকে আরো গভীর ও ব্যাপকতর করেছে।

১৯৩০ সালে কবি ইউরোপ ভ্রমণে যান। ইংল্যান্ডে থাকার সময় ভাটিংটন হলে তিনি ব্যালে নৃত্য দর্শন করেন। ব্যালের রচনা কৌশলও দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু প্রতিমাদেবী ব্যালে নৃত্য পরিচালনা, প্রতিদিনের ব্যালে রচনারকরণ কৌশলে অনুশীলন করেন। জাপান ও

Dhaka University Institutional Repository

জাভা ভ্রমণের পর এই ইউরোপ ভ্রমণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এরপরেই কবি প্রত্যক্ষভাবে নৃত্যনাট্যের সূচনা করেছিলেন শিশুতীর্থ ও শাপমোচন রচনার মাধ্যমে। শিশুতীর্থ ও শাপমোচনকে সেই অর্থে পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য না বলে নৃত্যনাট্যের সূচনা বলা হয়।

কবি জাভা, বালি প্রভৃতি দ্বীপ-পরিদর্শন করেন। সেখানে ঐসব দেশবাসীর নাচ দেখে কবি মুগ্ধ ও চমৎকৃত হন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির এক একটি ঘটনা কেবল নাচের দ্বারাই যে ব্যক্ত করা যায়, কবি তা সেই প্রথম দেখলেন।

"এদেশ উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ।... এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তনগানে সে আপন আবেগসঞ্চারের পথ পেয়েছি; এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। মেয়ে নাচে পুরুষ নাচে। এখানকার যাত্রাভিনয় দেখেছি, তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চলায়-ফেরায়, যুদ্ধে-বিগ্রহে, ভালোবাসার প্রকাশে, এমন কি ভাঁড়ামিতে, সমস্তটাই নাচ।... সেদিন এখানকার এক রাজবাড়ীতে নাচ দেখছিলুম।... এই নাচ-অভিনয়ের বিষয়বস্তুটা হচ্ছেঠ শাল্ব-সত্যবতীর আখ্যান। এ থেকে বোঝা যায়, কেবল ভাবের আবেগ নয়, ঘটনা-বর্ণনাকেও এরা নাচের আকারে গড়ে তোলে... আমাদের দেশে একদিন নাট্য-অভিনয়ের সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশ তাদের বলে অভিয়েনস, অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ, তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যই অভিনয়।"... (জাভাযাত্রীর পত্র, পৃ: ২৫৪)।

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় নৃত্যনাট্য আলোচনা

১৯২৩ সালে রচিত বসন্ত থেকে ১৯৩১ এর নবীন পর্যন্ত বিভিন্ন ঋতুনাট্যে নৃত্য ছিল নিহারীকা রূপে। শিশুতীর্থ আর শাপমোচনে এসে তা দানা বাঁধে। একটি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে পরবর্তী পূর্ণাঙ্গ তিনটি নৃত্যনাট্যের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। সেদিকে থেকে শিশুতীর্থ বা শাপমোচনকে পরবর্তীকালের তিনটি নৃত্য নাট্যের ভ্রূণও বলা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে প্রচলিত ধ্রুপদি নৃত্যের প্রত্যেকটির এক একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন কথাকলি মুদ্রা প্রধান অভিনয়, কথক নাট্য প্রধান, মণিপুরী গীতধর্মী ও ব্যঞ্জনাপূর্ণ অভিব্যক্তি। ভরতনাট্যমের বৈশিষ্ট্য বীর্য, ভারতের লোকনৃত্যগুলোর মধ্যেও এক একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন কয়েকটি নাচ পুরুষের জন্য। কয়েকটি নারীদের জন্য। কোনোটি আবার নারীপুরুষ উভয়ের সম্মেলক নৃত্য। কিন্তু রবীন্দ্রনৃত্যের সকল ধারা একত্রে মিশেছে যেমন মিশেছে রবীন্দ্রনাথের গানে। বস্তুত কোন ধরনের নৃত্য কোন ধরনের অভিনয়ের উপযোগী রবীন্দ্রনাথ সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নৃত্যের সমাবেশ করেছেন। রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে চরিত্র অনুযায়ী নৃত্যাদর্শ গড়ে উঠেছে।

নৃত্যনাট্যগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যে এতে অভিজাত বা মুখ্য চরিত্রে ধ্রুপদী নৃত্যের ব্যবহার এবং সাধারণ বা গৌণ চরিত্রে প্রাদেশিক বা লোকনৃত্যের প্রয়োগ। চিত্রাঙ্গদার গ্রামবাসী বা বনচর, শ্যামার আহিরীনিবৃন্দ বা বন্ধু এবং চণ্ডালিকায় দইওয়ালা, চুরিওয়ালা, মেয়ে পুরুষ ইত্যাদিতে বাংলা ও কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলের লোকনৃত্যের প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইউরোপীয় ব্যালে নৃত্যের রচনাশৈলী রবীন্দ্রনাথকে নৃত্যনাট্য রচনা পদ্ধতি কল্পনায় অনেকখানি সহায়তা করেছিল। ব্যালের রচনা পদ্ধতি অনেকখানি শ্রম বিভাজনের রীতিতে হয়। ব্যালেতে যেমন প্রথমে একটি কাহিনী স্থির করে সেই অনুসারে সংগীত, নৃত্য, মঞ্চ, রূপসজ্জা প্রভৃতি গড়ে ওঠে। নৃত্য পরিচালকের উপর দায়িত্ব থাকে দৃশ্যগুলোকে যথার্থ বিন্যাস করার। এই

Dhaka University Institutional Repository

দিকটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহিক করেছিল। যদিও নৃত্যের ক্ষেত্রে তাকে অন্যের সহযোগিতা নিতে হয়েছিল তবু নৃত্য রচিত হয়েছে তারই নির্দেশ এবং ইঙ্গিতে। পূর্বকৃত অনেক খণ্ড খণ্ড গান ও নৃত্য পরবর্তীতে নৃত্যনাট্যে বিশেষত চিত্রাঙ্গদায় স্থান পেয়েছে। যৌথ নৃত্যের নির্দেশকের জন্য পূর্ব পরিকল্পিত খসড়ার সাহায্য নেয়া হতো। অর্থাৎ নৃত্যের প্রেরণা থেকেই নৃত্যনাট্যগুলো রচিত। প্রতিমূহূর্তে নৃত্য ও নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকের দিকে রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য রাখতে হতো।

চিত্রাঙ্গদা

১৯৩৬ সালে চিত্রাঙ্গদা কাব্যকে নৃত্য ও মূকাভিনয়ের মাধ্যমে ছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় করার পরিকল্পনা করেন প্রতিমা দেবী। রবীন্দ্রনাথ যে কথা শুনে চিত্রাঙ্গদাকে অভিনয় উপযোগী করে গানের পরিবর্তন করে কাহিনী ও ভাবানুযায়ী সাজিয়ে দেন। পূর্বকৃত অনেকগুলো খন্ড নাচ যেগুলো প্রতিমা দেবী চিত্রাঙ্গদায় রাখতে চেয়েছিলেন সেগুলোর উপযোগী গানের কথা পরিবর্তন করে দেন।

যেমন :

পূর্বের কথা	পরিবর্তিত কথা
সখী বহে গেল বেলা	রোদন ভরা এ বসন্ত
বাকি আমি রাখবো	আমার এ রিক্ত ডালি
ও বধু সুন্দরী	তৃষ্ণার শান্তি
দূরের বন্দু সুরের দুতীরে	কোন দেবতা সে
দেখা না দেখার মেলা	স্বপ্ন মদির নেশায়

নব কুমার সিংহ 'বাকি আমি রাখব না' গানটির সঙ্গে যে নৃত্য কম্পোজিশন করেছিলেন তাতে গানের কলির ফাঁকে ফাঁকে ছন্দানুযায়ী মণীপুরী খোলের বোল ছিল। তাতে নৃত্যটি অত্যন্ত জমজমাট লাগতো। এই নাচটি শ্রাবণগাথা এবং শাপমোচনে ব্যবহৃত আরেকটি নাচ, 'দেখা না

Dhaka University Institutional Repository

দেখার মেশা' সঙ্গে নৃত্বের কম্পোজিশনে অভিনবত্ব ছিল। নানা প্রকার নৃত্যভঙ্গির প্রয়োগে গানের উদ্দম ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চিত্রাঙ্গদায় যখন গানটি থাকবে বলে স্থির হয় তখন কবি কথা বদল করে,'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা'করে দিলেন।

শিলচরে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষকের পঞ্চম তালে একটি নৃত্য কম্পোজিশন করেছিলেন। সেই ছন্দে দূরের বন্ধু সুরের দুতীরে গান তৈরী করেছিল। ছন্দ ও ভঙ্গিবৈচিত্র্যে নাচটি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। চিত্রাঙ্গদায় এই নাচ ব্যবহারের জন্য কবি কথা বদল করে 'কোন দেবতা সে পরিহাসে' করে দিলেন। কোচিনের মহারাজার প্রেরিত কল্যাণের আম্মা শান্তিনিকেতনে লোকনৃত্যের ঢং-এ 'ওগো বধু সুন্দরী' গান এর সাথে তালের নাচ শিখিয়ে ছিলেন। এটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছিল কখনো শাপমোচনে কখনো শ্রাবণগাথায়। চিত্রাঙ্গদার জন্য কবি এই নাচটিকে 'তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি' গান দিয়ে গেঁথে দেন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত চিত্রঙ্গদা প্রায় ৪০ বার অভিনীত হয়। প্রথম দুবছর চিত্রঙ্গদার নৃত্য আঙ্গিকে মণিপুরী নৃত্যধারা প্রয়োগ বেশি দেখি। কারণ সে সময় শান্তি নিকেতনে ব্যাপকভাবে মণিপুরী নৃত্যের চর্চা চলছিল। এ ছাড়া ছিল মালাবার ও বাংলার অন্যান্য প্রাদেশিক লোকনৃত্যের ভঙ্গি।

১৯৪০ সালের পরে নৃত্যাঙ্গিকে অন্যান্য অনেক ধারা যুক্ত। সেই সময়ে জাপানী ছাত্র মাকী প্রাচীন জাপানী নৃত্য পদ্ধতি এবং ইউরোপীয় নৃত্যধারা মিশিয়ে মদনের ভূমিকায় নেচেছিলেন।

শান্তিদের ঘোষ জানাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, প্রতিমা দেবী থেকে শুরু করে শান্তি নিকেতন বাসী সকলেই এই নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালে কেলু নায়ার শান্তি নিকেতনে অধ্যাপক যোগ দেওয়ার পর অর্জুন কথাকলি নৃত্যভঙ্গিতেই করা হত। তবে শাস্ত্রবদ্ধ মুদ্রাভঙ্গি রবীন্দ্রনৃত্যে খাপ খায় বলে হাত, মুখ ও চোখের ভাবভঙ্গি প্রকাশ করা হত সহজ ভাবে, গানের ভাবের সাথে মিলিয়ে, কথাকলির বাঁধা নিয়মে নয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামবাসী, বনচর প্রভৃতি সমবেত নৃত্য কিছুটা সিংহলের ক্যান্ডি বা দেশীয় লোকনৃত্যের আদলে তৈরী করা হয়। চিত্রাঙ্গদায় লক্ষনীয় চার/চার ছন্দের মণিপুরী কাওয়ালী তালের আধিক্য। তার সঙ্গে দাদরা, ঝাপতালও তেওরা গৌণভাবে স্থান পেয়েছে। দক্ষিণী তাল তেওরা ও দাদরা যদিও ব্যবহৃত হয়েছিল তবুও তা মণিপুরী খোলেতেই বাজানো হত। কারণ মণিপুরী নাচের সঙ্গে খোলের বোল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং মণিপুরী খোলেই এইসব তালবাদ্য অন্য এক আমেজ নিয়ে আসতো। পরবতীকালে অবশ্য কুরূপা চিত্রঙ্গদার মঞ্চে প্রবেশ এবং শিখার দৃশ্য এবং অর্জুনের প্রবেশের দৃশ্যে দক্ষিণ ভারতীয় তাল যন্ত্র চাড্ডা, মৃদঙ্গম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

নৃত্যকে মাঝে মাঝে স্বচ্ছন্দ্য বজায় রেখে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এবং তার স্বরূপ ও স্বভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য, কেবল মাত্র তাল যন্ত্রের সঙ্গে নৃত্যের প্রচলন আছে ভারতীয় সব নৃত্যপদ্ধতিতেই। রবীন্দ্রনাথ এই পদ্ধতি অনুমোদন করেছেন কখনো কখনো। চিত্রাঙ্গদায় দেখা যায় প্রথম গানটি নেপথ্য থেকে পাওয়া হয়, তার পরই তালবাদ্যের সঙ্গে চিত্রঙ্গদা ও সহচরিদের মঞ্চে প্রবেশ এবং শিকারের আয়োজন সূচক নৃত্য। চিত্রাঙ্গদার স্নানে আগমনের দৃশ্য, গ্রামবাসীদের অস্ত্রদানের দৃশ্য ইত্যাদি।

চিত্রাঙ্গদার নৃত্যের আর একটি উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য আবৃত্তির সঙ্গে নাচ। চিত্রাঙ্গদা রচিত হওয়ার পূর্বেই কবি এই দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। চিত্রাঙ্গদার ২২টি নৃত্য ছন্দে আবৃতি রয়েছে। প্রথম যুগে কবি নিজে সাধারণ ভাবে আবৃত্তিগুলো করতেন। পরবর্তী আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যছন্দে অভিনয়ের প্রচলন করলেন। তার পর থেকে এই রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে। নাটকের ঘটনাসূত্রের যোগ রাখা এবং দর্শকচিত্রকে বিশ্রাম দেওয়াই এর কাজ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্যামা

১৯৩৬ সালে শ্যামা যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন তার নাম ছিল পরিশোধ। কথা ও কাহিনী কাব্যগ্রন্থের পরিশোধকে নৃত্যাভিনয়ে পরিকল্পনা করেন প্রতিমা দেবী। রবীন্দ্রনাথ গল্পটি নিজের মতো সাজিয়ে নতুন নতুন গান তৈরী করে পরিশোধকে নৃত্যভিনয়ের উপযোগী করে তৈরী করে দেখল প্রথম অভিনীত হয় ১০ ও ১১ ই অক্টোবর কলকাতায় আশুতোষ কলেজের রঙ্গমঞ্চে। ১৯৩৮ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে পরপর দুদিন পরিশোধ নৃত্যকাব্যের অভিনয় হয়। শান্তিদেব ঘোষ এর লেখায় জানা যায়। 'এবারকার পরিশোধ অভিনয়ের নৃত্যে আমরা নতুন ভাবে একটি পরীক্ষায় হাত দিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম ভরতনাট্যম, মণিপুরী, কথুক, কথাকলি ও সিংহলের ক্যান্ডি নাচকে নাটকের চরিত্রানুযায়ী ব্যবহার করতে। যেমন: মৃণালিনী(সারাভাই) শান্তি নিকেতনে ছাত্রী হিসেবে যোগদানের পূর্বে ভারত নাট্যম শিখে এসেছিলেন তাঁকে বজ্রসেনের গানের সঙ্গে ভরতনাট্যমের নৃত্যভঙ্গিকে অভিনয় করার জন্য তৈরী করা হলো। নন্দিতা (কৃপালিনী) শ্যামার নাচ তৈরী করলেন মণিপুরীতে। আশা ওঝা জয়পুর ঘরানার কথুক নৃত্যে ভালো করেই শিখে এসেছিলেন উত্তিয়ের ভূমিকায়। তার গান কটির নাচ তৈরী হয়েছিল খাটি কথুক নাচের অভিনয় পদ্ধতিতে। কথাকলি নৃত্যে প্রহরীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন কেলু নায়ার। সিংহলের ছাত্র অনঙ্গলাল কোটালের চরিত্রে অভিনয় করেন ক্যান্ডী নাচের আঙ্গিকে। সখীদের নাচে ছিল মণিপুরী নাচের প্রাধান্য।'

রবীন্দ্র নৃত্যে ধ্রুপদী নৃত্যধারায় আরেকটি দিক কথকযুক্ত হয় আশা ওঝা নামের শান্তি নিকেতনের তৎকালীন একটি অবাঙ্গালী ছাত্রীর মাধ্যমে। কবি আশার নাচ দেখে মুগ্ধ হন এবং তারই ইচ্ছা অনুসারে তাকে উত্তিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয়। আশার অবস্থাপন্ন পিতা সে খবর শুনে কথক নৃত্যের গুরুকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন। আশা তার গুরুর সহযোগীতায় কথক এ শৈলীতে উত্তিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে মুগ্ধ করে। পরবর্তীতে শান্তিনিকেতনের কথকের ভাল শিল্পী আর আসেনি বিধায় রবীন্দ্রনৃত্যধারায় কথকনৃত্য সংযুক্ত হতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে এ কথা অনায়াসে বলা যেতে পারে যে কবি তার গানের সঙ্গে নাচের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য যখন যে পদ্ধতির নাচের ছেলেমেয়ে বা শিল্পী পেয়েছেন তাকেই ব্যবহার করেছেন। এবিষয়ে প্রচলিত ধ্যান ধারণার নৃত্যপদ্ধতির প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ বা গোড়ামি কোনোটাই তার ছিল না। তার লক্ষ্য ছিল খন্ড নাচের গানের বা নৃত্যেনাট্যের যে রসটি প্রকাশ করার কথা তা সঠিক ভাবে প্রকাশিত হলো কিনা। যেমন কোটালের চরিত্রে ক্যান্ডী নৃত্যভঙ্গিতে যে অভিনয় করা হয়েছিল তাতে উত্তিয়দের হত্যার দৃশ্যে। শেষ দিকে তেহাই এর সাথে তলোয়ার হাতে অঙ্গলাল উত্তিয়ের ওপর ঝাপিয়ে পড়ার মূহুর্তেই বাতি নিভিয়ে অন্ধকার করে দেওয়া হয় নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এই নাচটি নাটকের প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছিল। ক্যান্ডী নৃত্যে তলোয়ার হাতে কোনো নাচ ছিল না।

মিশ্রনের চুড়ান্ত পরীক্ষার নিদর্শন শ্যামা নৃত্যনাট্যের মধ্যে রয়েছে। শ্যামার মূল নৃত্যাদর্শ গড়ে উঠেছে চরিত্রের উপযোগী করে।

শ্যামার নাচে প্রত্যেক নৃত্য পদ্ধতির নিজস্ব রীতিতে অভিনয়ের প্রয়োজনে বোলের নাচ ব্যবহার করা হয়েছিল। শুরুতে বজ্রসেন ও বন্ধুর প্রবেশের দৃশ্য, বন্দুর পলায়ন, কোটালের প্রবেশ, বজ্রসেনের পলায়নের পর তালের নৃত্য : উত্তিয় বধের প্রস্তুতি নৃত্য ইত্যাদী। ১৯৩৯ সালে অভিনয়ের সময় কবি পরিশোধ নাম পরিবর্তন করে শ্যামা নামকরণ করেন। সে নামই চলে আসছে।

চন্ডালিকা

১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রতিমা দেবী প্রথম চন্ডালিকা গদ্যনাটকটিকে নৃত্যাভিনয় করার পরিকল্পনা করেন এবং সেইমত দৃশ্যানুযায়ী সাজান। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পনাটির খসড়া দেখে একটি পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যে পরিণত করবেন বলে স্থির করেন। কলকাতায় ১৮ থেকে ২০ মার্চ

Dhaka University Institutional Repository

চন্ডালিকার অভিনয় হয়। চন্ডালিকার নৃত্যসমাবেশ করা হয়েছিল বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। মূলত: দক্ষিণী নৃত্যধারাকে ব্যবহার করাই ছিল এ লক্ষ্য। মূল দুটি চরিত্র মা ও প্রকৃতি কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি পেয়েছে। নাটকের শেষ দৃশ্যে জাভা বালি ও কেরলের ছায়া নৃত্যের মাধ্যমে দেখার নির্দেশ ছিল। অবশ্য ছায়ানৃত্য নানা প্রতিকূলতার কারনে কখনোই করা সম্ভব হয়নি। এর বদলে মৃদু আলোয় ইউরোপীয় নৃত্যরীতির আদর্শ হয়েছিল।

নটীর পূজা

'নটীর পূজা' প্রকৃতপক্ষে নৃত্যনাট্য নয়। এটা সাধারণ নাটক (পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য) তবে দুই কারণে নৃত্যনাট্য-পর্যায়ে এটার উল্লেখ প্রয়োজন। নটীর পূজা হচ্ছে নৃত্যের দ্বারা নটীর চরম আত্মোৎসর্গের নৃত্যের উপরই এই নাটকের রস বস্তু নির্ভর করছে। নটীর নৃত্য এই নাটকের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। এই নৃত্যের মধ্য দিয়ে নাটকটি একটি চরম অবস্থায় উঠে এক করুণ-গভীর মাধুর্যে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ,নটীর পূজার নৃত্য হতে রবীন্দ্রনাথ নাচের ভাবী সম্ভাবনায় স্থিরনিশ্চয় হলেন। নটীর পুজা প্রথমে শান্তি নিকেতন ও পরে কলকাতায় কয়েকবার অভিনীত হয়ে বাঙ্গালী সমাজে নৃত্য সম্বন্ধে এক অপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে। মণিপুরী নাচের উপর নির্ভর করে শ্রীমতীর নৃত্য গড়ে উঠে।

শাপমোচন

এই নামে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের একটি সুদীর্ঘ গদ্য-কবিতা এই নাটকের মূল। এর মধ্যে সৌন্দের্যের মোহ ও প্রকৃত প্রেমের দ্বন্দ রূপায়িত। রাণী কমলিকা অরুনেশ্বরের কুৎসিত চেহারা দেখে ঘৃণায় তাকে ত্যাগ করে গেল, স্বামীর প্রেমের মূল্য বুঝিতে পারল না; তারপর বিরহের দুঃখ

Dhaka University Institutional Repository

ও আত্মগ্লানির অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া সে প্রেমের মূল্য বুঝিল, বুঝিল কালের বুকেই বাস করে নয়ন-ভুলানো আলো। তখনই গদগদ কণ্ঠে, অপলক চোখে বলিল, প্রভূ আমার, প্রিয় আমার, এ কী সুন্দর রূপ তোমার।

ইহার আখ্যানবস্তু ও 'রাজা' নাটকের আখ্যানবস্তু প্রায় এক।

গদ্য-কবিতা হতে আবৃতি, সংগীত ও নৃত্যে ইহার রূপ দেওয়া হয়। প্রথম অভিনয়ে কবি স্বয়ং এটার গদ্য অংশ সমূহ পাঠ করেছিলেন।

"শাপমোচন এর যুগে আমরা প্রথম চেষ্টা করলুম নাচের মধ্যে নাটকের বিষয় আনতে। গুরুদেবের জয়ন্তী উৎসবের সময় য়্যুনিভার্সিটির ছাত্রদের অনুরোধে তিনি 'শাপমোচন' এর কথাবস্তু লিখিছিলেন এবং কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়ির দালানে স্টুডেন্ট ডেতে প্রথম এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের গল্পাংশকে অনুসরন করে নাচ দেওয়া হয় এবং নাটকীয় সংঘাতকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে মুক- অভিনয় দ্বারা ভাবকে ব্যাক্ত করা হয়েছিল। এই নাটক প্রথমে লক্ষ্যে পৌছায় ও পরে বহুবার মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিংহল অভিনীত হতে হতে পরিণতি লাভ করেছে।"

সাধারণ ভাবে খন্ড নাচ বা ঋতু নাট্যের নাচের পোষাক। নৃত্যনাট্যে কাহিনী এবং চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরিকল্পনা করা হতো। যেমন চিত্রাঙ্গদার পোষাক সম্পর্কে শান্তিদেব ঘোষ জানাচ্ছেন।

চিত্রাঙ্গদা ও তার সখীরা প্রথম দৃশ্য যে সাজটি পরত, দ্বিতীয় দৃশ্যের সময় তার পরিবর্তন করা হোত। চিত্রাঙ্গদার নৃত্যনাট্যের ২য় দৃশ্যের মেয়েদের সাজটি প্রথম পরিয়ে তার উপরে প্রথম দৃশ্যের সাজ পরানো হোত অর্জুনের সহচরসহ নাচ ও বিরতীর সময়ে দ্রুত উপরের সাজটি খুলে ফেলা হোত। প্রথম দৃশ্যে পুরুষবেশে চিত্রাঙ্গদা ও সখীদের শাড়ীর উপরে বর্ম পরানো হতো। মাথায় থাকতো শিরস্ত্রান। দ্বিতীয় দৃশ্যে এই বর্ম ও শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলা হতো। আবার শেষ দৃশ্যে চিত্রাঙ্গদা যখন নিজের পরিচয় মেলে ধরেছে আমি চিত্রাঙ্গদা গানের সঙ্গে। তখন চিত্রাঙ্গদা সাজ বদল করে বিবাহের সাজে মাথায় উড়নি সংকারে মঞ্চে প্রবেশ করতো।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্যনাট্যের পর্যালোচনা

কবি জীবনে প্রথম নাটক আরম্ভ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে গানকে অবলম্বন করেই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি গীতিনাট্য আগাগোড়া গান গেয়েই অভিনয় করা হতো। এগুলি দস্তুরমতো নাটক,– কোনো বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করে এর নানা দৃশ্যে বিভক্ত। এতে পাত্রপাত্রীর সমস্ত সংলাপ ছিল গানে। কথাবার্তার ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে গানের সূরে তারা পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন চালাতো। এগুলি ছিল সুরের নাটক, এর সঙ্গে কোনো নৃত্য ছিল না।

তারপর বিভিন্ন ধরনের অনেক নাটক কবি লিখেছেন, কিন্তু এই প্রকার সংগীত সর্বস্ব নাটক আর লিখেন নি। মধ্যজীবন হতে দেখা যায়, কবির নাটকে উত্তরোত্তর গানের সংখ্যা বেড়েই চলেছিলো। প্রকৃতি সম্পূর্ণযুক্ত নাটক 'শারদোৎসব' ও 'ফাল্গুনী' এর গান 'আজ আমাদের ছুটি', 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' প্রভৃতিতে কবি গানের সঙ্গে একটু আকটু নাচ প্রবর্তন করেন। শারদোৎসবের গান

আজ আমাদের ছুটি
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

প্রভৃতি গানের সঙ্গে নাচের আমেজ আনবার প্রথম চেষ্টা করেন। 'ফাল্গুনীতে কবি অন্ধ বাউল সেজে গানের সঙ্গে নিজেই নেচেছিলেন।

তারপর নানা ঋতুনাট্যের মধ্যে কবি বিশেষভাবে নাচ প্রবর্তন করেন। এই ঋতুনাট্যগুলি গানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে গঠিত। পালাগানের মণিপুরী নৃত্যের ভঙ্গিই বেশির ভাগ গ্রহণ করা হয়েছিল, অন্যান্য নৃত্যেও সামান্য কিছু ছিল। এসব নৃত্য গানকে অনুসরণ করেই নানা

Dhaka University Institutional Repository

ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে, তালের ছন্দের সাথে পৃথকভাবে নৃত্যপ্রদর্শনের চেষ্টা এর মধ্যে করা হয়নি।

এই সময় 'নটীর পূজা' নাটকে শ্রীমতীর শেষনৃত্য সকলকে মুগ্ধ করে। এটি শান্তি নিকেতনে নিযুক্ত মণিপুরী নৃত্য-শিক্ষকের শিক্ষার ফল, তখন হতেই শান্তিনিকেতনের মেয়েরা এই নৃত্যাভিনয়প্রথা শিক্ষা করতে আরম্ভ করে। 'নটীর পূজা' ও ঋতুনাট্যগুলির মধ্যে নাচের প্রবর্তনের ভাবের যে অপূর্ব সুন্দর রসমূর্তি রচিত হতে পারে, কবির উচ্চাঙ্গের আর্টিস্ট মন তা বুঝতে পেরে নাচের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েন এবং নাচের নানা রূপ সম্ভাবনা ও পরিকল্পনা চিন্তা করতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

চন্ডালিকার একটি দৃশ্য [শ্রীশম্ভু নাথ সাহা]

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্যনাট্যে গানের আঙ্গিক

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলির গানের আঙ্গিকগত দিক আলোচনায় প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, নৃত্যই হচ্ছে এর লক্ষ্য, গানের সঙ্গীত রস প্রয়াণে মুখ্য নয়। নৃত্যরস সৃষ্টি করাই এর উপজীব্য। সুতরাং নৃত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এর বিচার বা বিশ্লেষণ করা উচিৎ এবং নৃত্য কেন্দ্রীক বলেই নৃত্যের ও গানের দৃশ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

অনিয়মিত দৃশ্যঃ

ভাব ও নৃত্যের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার জন্যই গানের সাথে সাথে দৃশ্যের পরিবর্তন হয়ে থাকে। নৃত্যনাট্যের গানে দৃশ্য খুবই অনিয়মিত। যেমন,

মোহিনী মায়া এল
এল যৌবন কুঞ্জ বনে
এল হৃদয়শিকারে
এল গোপন পদসঞ্চারে
এল স্বর্ণকিরণবিজরিত অন্ধকারে।

আর তারপরেই-

পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি
হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায়
বাজায় বাঁশি।

Dhaka University Institutional Repository

হা হতভাগিনী, ঐকী অভ্যর্থনা মহতের এল দেবতা তোর জগতের

গেল চলি

গেল তোরে গেল ছলি...

অর্জন! তুমি অর্জুন!

সংলাপধর্মঃ

নৃত্যনাট্যের মধ্যে বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করতে হয়, সংলাপধর্ম স্ফূটতর হয়ে উঠেছে। সাধারণত কোন কিছুকে আবেগের সাথে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনবার উচ্চারণ করা হয়। হয়তো নৃত্যের তেহাই রীতির প্রভাবও এর পিছনে রয়েছে। এই বিশেষত্ব নৃত্যনাট্যের মধ্যে কিভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তা স্মরণযোগ্য এবং গানের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ।

ক. 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে

ঢেউ দিল ঢেউ দিল ঢেউ দিল আমার মর্মতলে

মন রয়না, রয় না, রয়না ঘরে

ধিক্ ধিক্ ধিক্ [দ্বিতীয় দৃশ্য]

ভয় নাই, ভয় নাই ভয় নাইরে [চতুর্থ দৃশ্য]

ধন্য ধন্য ধন্য আমি [ষষ্ঠ দৃশ্য]

খ. 'শ্যামা' থেকে

না না না বন্ধু [প্রথম দৃশ্য]

ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে জানিনে দ্বিতীয় দৃশ্য]

বোলো না বোলো না বোলো না

মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা [চতুর্থ দৃশ্য]

Dhaka University Institutional Repository

গ. **'চন্ডালিকা' থেকে**

ত্বরা কর, ত্বরা কর, ত্বরা কর [প্রথম দৃশ্য]

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম, নতুন জন্ম আমার [দ্বিতীয় দৃশ্য]

আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয় [তৃতীয় দৃশ্য]

চিত্রধর্মঃ

নৃত্য মূলত রূপপ্রধান শিল্প বলেই প্রায়সম্পূর্ণভাবেই চিত্রধর্মী। যেমন নৃত্যনাট্য চিত্রালোপের প্রথম দৃশ্যের সূচনার গান। (ওরা ওরা ওরা ওরা মন মম গরজে), শ্যামাতে বিশেষভাবে কোটালের অনেকগুলি, চন্ডালিকাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা, অনুচরের,গ্রামবাসীদের এবং মেয়েদের গানগুলি। এগুলোর প্রতিটি অংশ নৃত্যাভিনয়ে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

নৃত্যনাট্যের গায়ন পদ্ধতি

রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের গানগুলি আগাগোড়ার তালে গাইতে হয়। বস্তুতঃ নৃত্যনাট্যের গানগুলি ছন্দে গাওয়া আবশ্যক। কেননা নাটকীয়তা বা রস এ ছন্দকেই কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়। অবশ্য মাঝে মাঝে বিনা তালে গাইতে হয় এমন গানও আছে।

ছন্দ বৈচিত্র্যের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে লয় বৈচিত্র্যের প্রশ্নটিও জড়িত।

এর দৃষ্টান্ত -

ক. ফিরে যাও, কেন ফিরে ফিরে যাও (শ্যামা)– ঝাঁপতাল

খ. আমি তোমারে করিব নিবেদন (চিত্রাঙ্গদা)– ঝাঁপতাল

গ. ওরে পাষাণী কি নিঠুর মন তোর (চন্ডালিকা)– ঝাঁপতাল

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি গানের ছন্দ এক। কিন্তু লয়ের পার্থক্য রয়েছে। প্রথম গানটি মধ্য লয়ে, দ্বিতীয় গানটি বিলম্বিত লয়ে এবং তৃতীয় গানটি একটু দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়ে থাকে।

গায়ন পদ্ধতির দিক থেকে নিম্নে একটি নৃত্যনাট্যের গানের লয় নির্দেশ করা গেলো।যেমন চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যের প্রথম গানটি মধ্য লয়ে গাওয়া হয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট **'আমার মালার ফুলের দলে আছে'** গানটির ছন্দ তাল ফেরতা, যথাক্রমে দাদরা ও কাহারবাতে রচিত।

গানটির লয় যথাক্রমে

আমার মালার ফুলের – মধ্য

আন গো ডালা – দ্রুত

মালা পর গো – বিলম্বিত

চন্দ্র করে অভিষিক্ত – দ্রুত

তালের ব্যবহার

প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যে দাদরা, কাহারবা, ঝাঁপতাল, ঝম্পক, তেওড়া তালগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যেভাবে গায়কীর নির্দেশ করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে প্রায়শই তালগুলি ভেঙ্গে গাইতে হয়। লয়ের তারতম্যের জন্যই ছন্দবৈচিত্র্য ঘটেছে। বস্তুতঃ ছন্দ ও লয়ের বৈচিত্র্যই নৃত্যনাট্যের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য।

Dhaka University Institutional Repository

সুর সমাবেশ

বাউলের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নৃত্যময়তা। নৃত্যনাট্যের গানও সম্পূর্ণভাবেই এই চেতনার আলোকেই আলোকিত। নৃত্যনাট্যের গানে প্রায়শই কোন রাগ-রাগিনী সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। সুর বিশ্লেষণের মধ্যে রাগ-রাগিণীর একটা আভাস পাওয়া যায় মাত্র। দৃষ্টান্ত হিসেবে

ক. **চিত্রাঙ্গদা–**

মোহিনী মায়া এল	–	মিশ্র ভৈরব
বধুঁ কোন আলো	–	সিন্ধু ভৈরবী
ক্ষণে ক্ষণে	–	কাফী টোড়ী
তাই আমি দিনু বর	–	বেহাগ-খাম্বাজ
আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায়	–	ইমন-বেলাবল

নৃত্যনাট্যের গানে সামগ্রিকভাবে কিত্তন ও বাউলের অন্তর্নিহিত বা অন্তঃশীল প্রভাব ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবেও ওই দুটি ঢংয়ের অসংখ্য গান রয়েছে। দৃষ্টান্ত

খ. **শ্যামা**

এই পেটিকা আমার	–	কীর্তনাঙ্গ
পুরী হতে পালিয়েছে	–	কীর্তনাঙ্গ

তাছাড়া মিশ্রভাবে (বাউল ও কীর্তনাঙ্গ)ঃ-

তুমি ইন্দ্রমনির হার...

ভালো ভালো তুমি...

গ. **চন্ডালিকা**

এ নতুন জন্ম নতুন জন্ম	–	বাউলাঙ্গ
বলে, দাও জল, দাও জল	–	কীর্তনাঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

সুর সমাবেশের দিক থেকে নৃত্যনাট্যের আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অনুভব করা যায়। যেমন প্রত্যেকটি গানের সঙ্গে পরবর্তী গানের প্রত্যেকটি ছন্দের সাথে পরবর্তী দৃশ্যের সুর প্রবাহের এক ওতপ্রোত যোগ রয়েছে। কোন একটি সুরের রেশ নিয়েই পরবর্তী গানটি রচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাসের দেশ-এর একটি দৃশ্য

[শ্রীশম্ভু সাহার সৌজন্যে]

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্য সমাবেশ

রবীন্দ্র নৃত্য-সমাবেশে যা কিছু স্ফূরণ তা গানের ছন্দ ও লয়কে কেন্দ্র করেই। নৃত্য ও গান পরস্পরের পরিপূরক, দেহ আত্মার মতো। রবীন্দ্রপ্রতিভার যে বৈশিষ্ট্য প্রবণতা সঙ্গীতের মধ্যে ফুটে ওঠেছে সেরকম প্রেরণা থেকেই এই বিশিষ্ট নৃত্যধারার জন্ম। বস্তুতঃ কোন ধরনের নৃত্য কোন রকম অভিনয়ের উপযোগী রবীন্দ্রনাথ সেদিকে লক্ষ্য রেখেই নৃত্যনাট্যের মধ্যে নৃত্য সমাবেশ করেছেন। নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য সমাবেশ প্রধানত মণিপুরী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠেছিলো।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত শান্তিদেবঘোষ ১৯৬০ সালে মুম্বাইয়ে ঐ অঞ্চলের কয়েকজন নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্গদা নৃত্য সমাবেশ করেছিলেন।

ক.	কুরুপা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন	–	ভরতনাট্যম,কথাকলি
খ.	সুরুপা চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুন	–	মণিপুরী
গ.	মদন	–	মণিপুরী, কত্থক
ঘ.	গ্রামবাসী	–	লোকনৃত্য

তালনৃত্য

নৃত্যনাট্যগুলোতে তালনৃত্য নীতি প্রযুক্ত। চিত্রাঙ্গদা ও তার সহচরীবৃন্দের মঞ্চপ্রবেশের স্বীকারের আয়োজন সূচক নৃত্যটি তাল নৃত্যে রূপায়িত। শ্যামাতেও প্রথম দৃশ্যের শুরু, দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরু, তৃতীয় দৃশ্যের শ্যামা ও বজ্রসেনের দ্বৈত নৃত্যে তাল নৃত্য সংযুক্ত। চন্ডালিকাতেও এর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্যনাট্যের রূপান্তর

চিত্রাঙ্গদা কাব্যনাট্যের মূলে আছে মহাভারতের কাহিনী। মূল কাহিনীর যে রূপান্তর করিয়েছেন কবি তা সত্যিই বিস্ময়কর। মূল কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনী শুরু হয়েছে অনঙ্গ আশ্রমে। এবং নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে আছে চিত্রাঙ্গদা'র স্বীকার আয়োজন। চরিত্র কত পরিবর্তন ও উল্লেখযোগ্য। মূল নাটকে চরিত্র ছিলো চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন, মদন, বসন্ত এবং বনচরগণ। নৃত্যনাট্যে এর বহু পরিবর্তন ঘটেছে। অর্জুন চরিত্রটি কাব্য নাট্যেও প্রাধান্য পায়নি। এক্ষেত্রেও প্রায় গৌন। মুখ্য জড়িত সহচরীগণ সহ চিত্রাঙ্গদা। মদন চরিত্রটি যথাযথ থাকলেও সহচর বসন্ত চরিত্রটি বর্জিত হয়েছে নৃত্যনাট্য। বানরবৃন্দ নৃত্যনাট্যে গ্রামবাসীতে পরিণত হয়েছে।

ভাষা

নৃত্যনাট্যের মধ্যে মূল কাব্যনাট্যের ভাষা সামান্য পরিবর্তিত আকারে কোথাও কোথাও ব্যবহৃত। যেমন-

	মূল কাব্যনাট্য		**নৃত্যনাট্য**
১.	চিত্রাঙ্গদা '... ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি পতিযোগ্য নহি বরাঙ্গণে	১.	বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গণে ব্রহ্মচারী ব্রতধারী।।
২.	অর্জুন। কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য কিম্বা মায়া?	২.	কাহারে হেরিলাম! আহা! সেকি সত্য, সেকি মায়া,সেকি কায়া
৩.	মদন। তবে তাই হোক	৩.	তাই হোক, তবে তাই হোক...

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্যনাট্যের কাব্যবস্তু

ত্রয়ীনৃত্যনাট্যের কাহিনীর উপজীব্য প্রেম। চিত্রাঙ্গদা'র রূপচ প্রেম যখন পরাজিত হলো তখন চিত্রাঙ্গদা নারীত্ব ধিক্কার দিয়ে উঠলো। সে নিজের সত্যিকার পরিচয় দিলো। এতদিনে অর্জুনের মনেও যেনো কোথাও একটা গ্লানি ছিলো। চিত্রাঙ্গদা যথার্থ পরিচয় পেয়ে অর্জুনকেও বলতে হয়েছে 'ধন্য আমি ধন্য!'।

শ্যামাতেও এই প্রেমেরই কাহিনী তবে তার পরিণতি ট্রাজেডি। বজ্রসেনকে ভালোবেসে তাকে পাবার জন্য অর্থাৎ আংশিক জীবনসত্যকে স্থান দিতে গিয়ে শ্যামা সমগ্র জীবন সত্যের অবমাননা করলো বলেই তার প্রেম ব্যর্থ হয়।

চন্ডালিকার মূল তত্ত্বটিও প্রেম। তবে প্রেমের স্বরূপ স্বতন্ত্র। আনন্দ যেই মুহূর্তে প্রকৃতির হাত থেকে জল পান করলো সেই মূহূর্তে প্রকৃতির জীবনে এলো জোয়ার- আনন্দের, মুক্তির, স্বপ্নের এবং নারীত্বের। এই পরিণতি চিত্রাঙ্গদা'র মতোই প্রেমের চরিতার্থতা।

এই তিনখানি নৃত্যনাট্যেরই বিষয় বা ভাববস্তু এক কামনা থেকে প্রেমে উত্তরণ। শ্যামাতে তা হয়নি। অশ্রুজলে সমাপ্তি। চিত্রাঙ্গদায় তা স্বীকৃত, চন্ডালিকাতেও।

নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলা ও রূপসজ্জা

প্রাক-নৃত্যনাট্য মঞ্চকলার বিবর্তনের যে ধারাটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত, নৃত্যনাট্যের মঞ্চকলা তারই ক্রমোত্তরণ।

রবীন্দ্রনাটকে যখন থেকে নৃত্যকলার প্রবেশ ঘটেছে তখন থেকেই রঙ্গের সমারোহে ও বৈচিত্রের মধ্য দিয়েই নৃত্যনাট্যের উপযোগী মঞ্চকলার কথা ভাবতে হয়েছে। মঞ্চের দক্ষিণ প্রান্তে র পরিবর্তে পিছন দিকে গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রীবৃন্ত সমবেত হয়ে বসেন- সেই অংশটুকু রঙ্গীত কাপড়ের আবরণে ঘিরে মঞ্চকে বাস্তবিক পক্ষে দুভাগে ভাগ করা হয়। সমমানের অংশে নৃত্য

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পীরা অভিনয় করেন। ওহংসের মধ্য দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থান। এই নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ মঞ্চের একপাশে উপবিষ্ট থাকতেন।

অঙ্গসজ্জা বা রূপসজ্জারও শেষ পরিণতি লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিভিন্ন চরিত্র যেমন- বিশেষ কোন দেশকালের মানুষ নয়। তেমনি সজ্জাও। রূপসজ্জা নৃত্যের দিক থেকে মণিপুরী রীতি গ্রহণ করেছেন কিন্তু রূপসজ্জায় মোমলা বা মাগড়া বর্জন করেছেন। আহ্ সজ্জা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, বিশেষ করে নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে তা যেন নৃত্যভঙ্গির পরিপন্থী হয়ে না দাঁড়ায়। চরিত্রের উপযোগী করেই নৃত্য নাট্যের রূপসজ্জা করা হত।

মঞ্চকলা প্রকাশে আলোক সম্পাতের প্রশ্নটিও জড়িত। এক্ষেত্রে সব সময় লক্ষ্য রাখা দরকার রঙ্গের ব্যবহার যেন দৃশ্যমান পরিবেশ ও ভাবের উপযোগী হয় এবং কোথাও যেন তার মাত্রাধিক্য না ঘঠে।

নৃত্যনাট্য কাহিনীর মূলসূত্র

এ কথা অনেকেই জানেন যে, নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কল্পনজাত সৃষ্টি নয়। বস্তুতঃ এগুলির বিষয়বস্তু অন্যত্র থেকে সংগৃহীত। যেমন- নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'-র (পরিশোধ কবিতারও বটে) আখ্যান ভাব রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত 'the Sanskrit Buddhist literature of Nepal' নামক গ্রন্থ থেকে গৃহীত। নৃত্যনাট্য চন্ডালিকার কাহিনীও তদ্রুপ। এই নৃত্যনাট্য দুখানির আখ্যান ভাগ ঐ গ্রন্থের যথাক্রমে মহাবস্তু অবদান ও শার্দুলকর্ণ অবদানে অন্তর্গত। তেমনি নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের তুলনা

যে কোন শিল্পেরই দুটি দিক। ১. বিশিষ্টতা ও ২. বহুর সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা। সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য প্রত্যেকটি সুকুমার শিল্পেরই এমন একটি করে স্বতন্ত্র রয়েছে যে, তারা সবাই আলাদা ধারায় অনন্য। প্রত্যেকটি আশ্রয় রয়েছে এক একটি উপায় উপকরণকে। প্রত্যেকের একটাই উদ্দেশ্য- রূপায়ন। অর্থাৎ কোন একটি রূপকে প্রকাশ করা। এই রূপ ও প্রকাশের পথে চলেছে গান, নৃত্য, নাটক, সাহিত্য। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ধারা নির্দিষ্ট গতিতে নির্দিষ্ট পথে চলতে চলতে এক সময় সবাই একটি প্রান্ত ভূমিতে এসে উপস্থিত হয়। আর সেই প্রান্তভূমির আদিতে আছে গীতিনাট্য ও শেষ প্রান্তে নৃত্যনাট্য। বাইরে থেকে এই সন্নিবেশ অর্থহীন ও তাৎপর্যহীন বলে মনে হলেও একথা স্পষ্ট যে, প্রথমে যদি গীতিনাট্যকে না পাওয়া যেত তাহলে হয়তো পরবর্তীতে নৃত্যনাট্যের বর্তমান রূপটি পাওয়া যেতো না।

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য এক অবিভাজ্য ছন্দময়োতার প্রকাশ। দুই-ই আদ্যন্ত গানে রচিত। তবুও তাদের মধ্যে কতকতগুলি মূলগত পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ

রচনার উদ্দেশ্য

গীতিনাট্যের গানগুলি যেমন বিশেষ ভাবে অভিনয়ের জন্য রচিত নৃত্যনাট্যের গানগুলি তেমন নৃত্যাভিনয়ের জন্য। এখানেই নৃত্যনাট্যের গানের বৈশিষ্ট্য।

গায়কী

গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের মধ্যে গায়কীর পার্থক্য আছে। গীতিনাট্যের গান অভিণয় যোগ ও ভাবানুযায়ী গাইতে হয় বলে আগাগোড়া তালে গাওয়া চলে না। আর নৃত্যনাট্য ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ আগাগোড়া তালে গাইতে হয়। নৃত্যের জন্যই এই তাল বজায় রাখতে হয়। এই লয় ও ছন্দের মধ্যেই রয়েছে নাট্য স্বকীয়তা।

Dhaka University Institutional Repository

রচনার সময়

গীতিনাট্য শিক্ষানুবিশীর যুগে রচিত এবং নৃত্যনাট্য শিক্ষানুবিশীর যুগে রচিত এবং নৃত্যনাট্য রসানুভূতির যুগে রচিত তাই তাদের ভাব সম্পূর্ণ আলাদা।

পাশ্চাত্যের সাথে তুলনা

গীতিনাট্য অপেরা ধর্মী ও নৃত্যনাট্য ব্যালেধর্মী।

উপাদান

গীতিনাট্যের প্রধান উপাদান সংগীত ও অভিনয় এতে নৃত্যের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কিন্তু নৃত্যনাট্যের ভাব প্রকাশের প্রথান বাহন নাচ। নাচ ছাড়া এর প্রকাশ কোন ভাবেই সম্ভব না।

সুরের নাটিকা

নৃত্যনাট্যগুলি পুরোপুরি গীতিনাট্য হলেও একে 'সুরের নাটিকা' বলা যায় না। কারণ সঙ্গীত ও নৃত্য পরস্পর পরিপূরক হলেও নৃত্যনাট্যে নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ। আর গীতিনাট্য সঙ্গীত ও অভিনয়ের নাটক।

প্রাধান্যতা

গীতিনাট্যগুলো পয়ারের কাঠামোতে রচিত হয় আর নৃত্যনাট্যে মাত্রাবৃত্তের প্রাধান্য বেশী।

অন্যগানের প্রভাব

গীতিনাট্যতে পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতে দেশীয় লৌকিক সুরের পভাব খুব কম। কিন্তু নৃত্য নাট্যে কীর্তন, বাউল ইত্যাদির প্রভাব আছে যথেষ্ট পরিমানে।

Dhaka University Institutional Repository

মিশ্র রাগ-রাগিনীর ব্যবহার

গীতিনাট্যের যুগেই মিশ্র রাগ-রাগিনীর ব্যবহার দেখা গেছে কিন্তু নৃত্যনাট্যে তা রয়েছে এক স্বতন্ত্র প্রকৃতির রূপায়ণে ও প্রকরণে।

কলা-কুশলীদের ভূমিকা

গীতিনাট্যে কলাকুশলীদের গানের সাথে সাথে অভিনয় (মঞ্চেই) করতে হয়। কিন্তু নৃত্য নাট্যে সঙ্গীত শিল্পী ও যন্ত্রীগণ মঞ্চের পিছনে থাকে এবং নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চে অভিণয় করেন।

শিথিল বাক্যবন্ধের ব্যবহার

নৃত্যনাট্যে শিথিল বাক্যবন্ধের ব্যবহার আছে। গীতিনাট্যে ছিলো কিন্তু নৃত্যনাট্যে তা এত বেশী যে একে গদ্যছন্দ বা Fee verse বলা হয়।

যেমনঃ

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম
নতুন জন্ম আমার
সেদিন বাজলো দুপুরের ঘন্টা
ঝা ঝা করে রোদ্দুর। ইত্যাদি

তেহাই রীতি

নৃত্যনাট্যে কোন বিশেষ আবেগ প্রকাশের জন্য একটি শব্দ অনেক সময় তিনবার উচ্চারিত হয়। নৃত্যের তেহাই থেকে সম্ভবত এটি এসেছে।

যেমনঃ

নৃত্য নাট্য 'শ্যামা' থেকে
ধিক্ ধিক্ ধিক্
যাও যাও ফিরে যাও ফিরে যাও বীর

কিন্তু গীতিনাট্যে এই রকম তিনবার উচ্চারণের কোন ব্যাপার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সুর সমাবেশ

সুর সমাবেশের দিক থেকে পার্থক্য নিরূপণ করতে গেলে দেখা যাবে- নৃত্যনাট্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলি গানের মধ্যে একটা সুর প্রবাহই যেনো বিভিন্নভাবে উচ্ছলিত হয়েছে। একটি গানের রেশ ধরেই যেন আরেকটি বা পরের গানটি রচিত। অর্থাৎ গানের সুরে একটা অখন্ড ঐক্য আছে এর সংলাপের ক্ষেত্রেও তাই। আবেগের উচ্চতা ও নিবতার মধ্যে দিয়ে কিভাবে নাটকীয়ভাব সৃষ্টি করতে হয় নৃত্যনাট্যের গানগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। গীতিনাট্যের সুর সমাবেশের মূল বিশেষত্ব গানগুলি রাগ-রাগীনির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও নাটকের প্রয়োজনে নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে অনেক মিশ্র ও অপ্রচলিত রাগ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুকুড়, লুম, গারা, ললিত যোগিয়া, গৌড় সারং ইত্যাদি। গীতিনাট্যে বস্তুত গানের ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখেই সুরারোপ করা হয়েছে এবং তাল তার সাহায্য করেছে।

নৃত্যের সূত্রে নাট্যের মালা

নৃত্যনাট্য গুলোকে নৃত্যসূত্রে নাট্যের মালা বলা যায়। নৃত্য ছাড়া এর রূপায়ণ কোনভাবেই সম্ভব নয়। গীতিনাট্য একমাত্র গানেরই প্রাধান্য।

মঞ্চ সজ্জা ও অভিনয়

নৃত্য নাট্যের মঞ্চকে মূলত দুইভাবে ভাগ করা হয়। সামনের অংশে নৃত্যশিল্পীরা। আর রঙ্গীণ কাপড়ে ঘেরা পেছনের অংশে শিল্পী ও যন্ত্রীরা বসেন। কিন্তু গীতিনাট্যের মঞ্চের কোন বিভাগ নেই। তবে পশ্চাত্যের বাস্তবধর্মীতার দিকে দৃষ্টিপাত থাকে।

রূপসজ্জা

গীতিনাট্যের রূপসজ্জার পাশ্চাত্যের প্রভাব যেমন, পোশাকে বনেদিপনা ও জৌলসের ছাপ। অন্যদিকে নৃত্যনাট্যের বিশেষ করে মণিপুরী ধরণ গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকের গান

বাংলা নাটকে জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান উপকরণ হিসেবে গান সর্বদাই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গতিহীন নাটক অর্থাৎ কেবল সংলাপ নির্ভর নাটক শ্রোতা দর্শকের মনে স্থায়ী জায়গা গড়ে তুলতে পারতো না বলেই গানকে বাংলা নাটকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সাধারনত বাংলা নাটকে গানের ব্যবহার হতো বিভিন্ন কারণে যেমন-

১. দর্শকদের অতিরিক্ত কিছু আনন্দ দেয়া
২. আবেগময় কোন মুহূর্তকে ঘনীভূত করা ও
৩. নাটকের গল্পের গতিময়তার একটি সাংকেতিক নির্দেশ দেবার জন্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা নাটকে সংগীত ব্যবহারের ব্যাপক ঐতিহ্য পরিপূর্ন হয়েও প্রচলিত উদ্দেশ্যে নাট্যসংগীত রচনা করেননি। পেশাদারি মঞ্চ বা নিয়মিত ব্যবসায়িক অভিনয় থেকে সম্পূর্ন বিচ্ছিন্ন থেকে দর্শকরুচি বা সস্তা গণ চাহিদার দিকটি রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্যকে কখনও নিয়ন্ত্রন করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকের গানের আনুমানিক পরিসংখ্যান

রবীন্দ্রনাটকে গানের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা কেউ বলেছেন ২২২৫ কেউ বলেছেন ২২৩২। এই মোট সংখ্যার নাটকের গানের সংখ্যা নির্ণয় করতে গেলে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যের গান হিসেবের আওতামুক্ত রাখাই উচিত কারণ সেগুলো মূলত নাটকের গান নয়। সেখানে গান ও নাটকে রয়েছে এক অভেদ রুপকল্প। কেবল গান দিয়েই নাটকের গতিময়তা চলেছে অবিরাম। গান দিয়ে পুরো নাট্য শরীর গঠিত। রবীন্দ্র নাটকের গানের হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে **'বসন্ত'**, **'শেষবর্ষণ' 'নবীন', নটরাজ', ঋতুরঙ্গশালা', 'শ্রাবনধারা'**র গান - কারণ এই সব রচনায় নাটকের অংশ ক্ষীন হতে হতে প্রায় অবলুপ্ত। গানই এর প্রাণ এবং গানই কেবল আমাদের মজিয়ে রাখে নাটকের অংশ বা সংলাপ নয়। এই হিসেবে আরো একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, কিছু গান একই

নাটকের রুপান্তও বা একাধিক নাটকে স্থান পেয়েছে। যেমন **'গুরু'** নাটকের অনর্গত ৭টি গানের মধ্যে ৬ টি গানই **'অচলায়তন'** এ ছিল। শুধু

'ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জোতির্ময়'

নতুন যোজনা। **'অরুপরতন'**-এ যে ২৫ টি গান আছে তার মধ্যে ১১ টি **'রাজা'** নাটকের অন্তর্ভূক্ত। সেই রকম **'ঋনশোধ'** নাটকের ১৩ টির মধ্যে ৬টি নতুন, ৭টি **'শারোদৎসব'** থেকে সরাসরি চলে এসেছে।

'আজ তোমারে দেখতে এলেম'

গানটি **'বউ ঠাকুরানীর হাট'** উপন্যাস থেকে **'প্রায়শ্চিত্য'** নাটকের মধ্য দিয়ে চলে এসেছে **'পরিত্রান'** নাটক পর্যন্ত।

'আরো আরো প্রভূ আরো আরো'

'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়'

'ওরে আগুন আমার ভাই'

- তিন রুপেই উপস্থিত **'প্রায়শ্চিত্য'**, **'মুক্তধারা'** এবং **'পরিত্রান'** এ। বিপরীতভাবে হিসেবের অন্তর্গত হয় তরুণ রবীন্দ্রনাথের যে সকল গান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকাবলীতে ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুন দ্বিগুন' (সরোজিনী)

'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' (অশ্রুমতী)

'আয় তবে সহচরী' (মানময়ী) ইত্যাদি গান।

উপরোক্ত হিসেবের পদ্ধতিতে রবীন্দ্রনাথের নাটকের গান মোটামুটি বলা যায় সাড়ে তিনশ থেকে কিছু বেশী। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত সকল নাটকের পাঠভেদ সংবলিত সংস্করণ প্রকাশিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সঠিক পূর্নাঙ্গ সংখ্যা বের করা কঠিন। যেমন **'রাজা ও রানী'** নাটকের ব্যবহৃত গান।

'আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে' ও 'বিসর্জন' নাটকের গান 'ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুন্ডু বেয়ে' গানটি প্রথম সংস্করনের পরে বর্জিত হয়। অবশ্য ১৯২৩ সালে নিম্নোক্ত চারটি গান বিসর্জনের অন্তর্ভুক্ত হয়-

১. জয় জয় পরমা নিস্কৃতি হে

২. আঁধার রাতে একলা পাগল

৩. আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে

৪. কোন ভীরুকে ভয় দেখাবি

১৮৯৫ সালে লেখা 'সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে' গানটি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে **'গৃহপ্রবেশ'** এ অভিনয় কালে হিমি'র কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছিল। ৬ আশ্বিন ১৩১৮ তারিখে **'শারোদৎসব'** এর অভিনয় কালে তিনটি নতুন গান সংযোজিত হয়।

১. ওগো শেফালি বনের মনের কামনা

২. আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি এবং

৩. আমাদের শান্তিনিকেতন

'তপতী'তে যতগুলি গান আছে' তাছাড়াও আরো কিছু গান লেখা হয়েছিল এই নাটকের জন্য। কিন্তু সেগুলি ব্যবহৃত হয়নি। জীবনের শেষদিকে **'ডাকঘর'** নাটক মঞ্চস্থ করাবেন ভেবে ঐ নাটকের জন্য যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলিও শেষপর্যন্ত **'ডাকঘর'** এ ব্যবহৃত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকে গান ব্যবহারের কারণ

রবীন্দ্রসমকাল পর্যন্ত বাংলা নাটকে গানের ভূমিকা আর রবীন্দ্রনাট্যে গীতিযোজনার প্রসঙ্গ বিচারের যোগ্য। উৎস হিসেবে এই দুই এর মূলে আছে মাত্রার চিহ্ন কিন্তু দুই এর অর্থই অত্যন্ত পৃথক। অন্য নাটকে গান যেন অনেকটা অগত্যা প্রয়োগ কিন্তু রবীন্দ্রনাটকে গানের ব্যবহার আমাদের কাছে ভিন্ন ধরনের এক পরিকল্পনার আভাস নিয়ে আসে। যার বাস্তব আভাস পাই তাঁর **'শারোদৎসব'** সহ পরবর্তীকালীন রচনাসমূহে। সেই সময় রচিত নাটকগুলিতে যেমন চোখে পড়ে সংগীতের বহুল প্রয়োগের প্রবনতা তেমনি চে'খে পড়ে একটি নতুন আঙ্গিকের বিন্যাস। এই বিন্যাসে যাত্রার প্রভাব তার ভাবনার অনেকখানি জুড়ে ছিল। **'রঙ্গমঞ্চ'** পর্বদুটি লক্ষ করলে এই বিষয়টি খানিক অনুমান করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাটক যাত্রার সঙ্গে প্রতিরোধী সম্পর্কে যুক্ত কিন্তু তিনি তাকে গ্রহন করেন অনুকূল আদর্শ হিসেবে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে এর গুরুত্বের ব্যবধান নেই। এ কথা তিনি ব্যক্ত করেন ১৩০৯ সালে এবং তারই ফলে 'ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে' তার কথা মনে রেখেই তিনি উৎসাহী হন পবরবর্তী নাট্য রচনায়। মঞ্চ ও দৃশ্যের পরিকল্পনায় যাত্রার সময় পরিবতীর্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ একই অভিপ্রায়ে তাঁর নাটকে যুক্ত করেণ গান।

নিবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-
রবীন্দ্রনাটকে গান ব্যবহারের কারণ সম্বন্ধে গভীর তথ্য ও তত্ত্বনিষ্ঠ আলোচনা রয়েছে।

কবি কখনও গানের ব্যবহার করেছেন নাট্যোৎকণ্ঠার অস্বস্তির মধ্যে দর্শক মনের স্বস্তি বিধানের জন্য। যেমন **'রাজা ও রানী'** নাটকে প্রথম সৈনিকের গান 'ওই আঁখি রে' এরুপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংযুক্ত হয়েছিল।

কখনও সেখানে জনপ্রমোদের ভাবনাও কাজ করেছে । বুঝিয়ে দেওয়ার চাইতে দর্শকমনকে গানের প্লাবনে ভাসিয়ে দিতেই যেন চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথঠাকুর

Dhaka University Institutional Repository

কখনও অভিনেতা অভিনেত্রীর গাইবার ক্ষমতার উপর নির্ভও করেছে নাটকের গানের সংখ্যা। যেমন **'রাজা'** নাটকে গুরুদেব ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহন করেন। তখনও তাঁর গাইবার ক্ষমতা ছিল, তাই বহুগান তাঁকেই গাইতে হয়।

বাউল, পাগল, বালকদল সৃষ্টি করে অনেক গান তাদের দিয়েও গাওয়ানো হয়। এই চরিত্রগুলোর রচনার উদ্দেশ্য ছিল সকল গান জানা এবং গাইয়ে ছাত্র ও কর্মীদের নাটকের মধ্যে টেনে আনা। এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে,রবীন্দ্রনাটকের গানের ব্যবহার শুধু আভ্যন্তরীন দাবীতে নয়,অনেক সময় তা হয়েছে একেবারে বহিরঙ্গ কারনেও।

শান্তি নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও নাটকের তার গান ব্যবহার করেছেন তাঁর শিক্ষাদর্শের প্রেরণায়। শান্তিনিকেতনের বাইরের পরিবেশ যেমন নিজের অজান্তেই ছাত্রদের মনকে তৈরী করে তুলতো তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে তুলবার একটি প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করতো।

'শান্তিনিকেতনের বাইওে প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরী করে তোলে তেমনি গান ও জীবনকে সুন্দর করে তুলবার একটি প্রধান উপাদান। এতে করে ওদের জীবনের একটি বড় জানালা খুলে দেওয়া হচ্ছে।'

'শারোদৎসব' ঋতুনাট্যে গান ও প্রকৃতির মিলনে খুঁজে পাওয়া যায় বিকাশোন্মুখ মনের জানালা। রবীন্দ্রনাটকের সাথে গানের সম্পর্কের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধুর্জটি প্রসাদ রবীন্দ্র প্রতিভার একটি বৈশিষ্টের কথা ইঙ্গিত করে লিখেছেন-

`There is a deeper connection between Tagore the composer and Tagore the dramatist then what appears on the surface. Poetry certainly, but it is not poetry merely. Tagore's musical composition can not but help the drama because of the very nature office genius.'

Dhaka University Institutional Repository

কবি প্রতিভার সঙ্গীতধর্মী ও গীতিধর্মী প্রবনতাই তার নাটকগুলোকে ক্রমশ গীতিময় করে তুলেছে এবং গান হয়ে উঠেছে তার নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ।

আলোচনার সুবিধার জন্য নাটকের প্রকৃতি - অনুসারে সমগ্র নাট্য সাহিত্যকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করে নেয়া হলো। প্রকাশ সময়ের পারম্পর্য অপেক্ষা অন্ত:প্রকৃতি ও বহি:প্রকৃতির ঐক্য শ্রেণীবিভাগে সহায়তা করে বলে মনে হয়। সেখানেই এক এক শ্রেনীর নাটকের রুপবন্ত্র ও রসবন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা পরিস্ফুট হয়ে উঠা সম্ভব হয়-

(ক)

গীতিনাট্য (সংগীতপ্রধান)

১. বাল্মীকি প্রতিভা
(কালমৃগয়া)

২. মায়ার খেলা
(নলিনী)

(খ)

কাব্যনাট্য (কাব্যপ্রধান)

১. চিত্রাঙ্গদা

২. বিদায়-অভিশাপ

৩. গান্ধারীর আবেদন

৪. সতী

৫. নরকবাস

৬. কর্ণকুন্তীসংবাদ

৭. লক্ষ্মীর পরীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

(গ)

রোমান্টিক ট্র্যাজেডি

(কাব্য ও নাটকের সমন্বয়)

১. রাজা ও রাণী (তপতী)

২. বিসর্জন

৩. মালিনী

(ঘ)

রূপক সাংকেতিক নাটক

(ভাব বা তত্ত্বপ্রধান)

১. প্রকৃতির প্রতিশোধ

২. শারদোৎসব (ঋণশোধ)

৩. রাজা (অরূপ-রতন)

৪. অচলায়তন (গুরু)

৫. ডাকঘর

৬. ফাল্গুনী

৭. মুক্তধারা

৮. রক্তকরবী

৯. কালের যাত্রা

১০. তাসের দেশ

(ঙ)

সামাজিক নাটক

(সামাজিক পরিবেশমূলক)

১. প্রায়শ্চিত্ত

(পরিত্রাণ)

Dhaka University Institutional Repository

২. গৃহপ্রবেশ

৩. শোধবোধ

৪. নটীর পূজা

৫. চন্ডালিকা

৬. বাঁশরী

৭. মুক্তির উপায়

(চ)

কৌতুকনাট্য

(কৌতুকপ্রধান)

১. গোড়ায় গলদ

২. বৈকুণ্ঠের খাতা

৩. চিরকুমারসভা

৪. হাস্যকৌতুক

৫. ব্যঙ্গকৌতুক।

(ছ)

ঋতুনাট্য

(ঋতুআশ্রয়ী ও গীতপ্রধান)

১. শেষবর্ষণ

২. বসন্ত

৩. নবীন

৪. নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

৫. শ্রাবণগাথা

Dhaka University Institutional Repository

(জ)

নৃত্যনাট্য

(নৃত্যপ্রধান)

১. চিত্রাঙ্গদা

২. চন্ডালিকা

৩. শ্যামা

৪. নটীর পূজা

৫. শাপমোচন

'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা বলে, 'আজ সমস্ত রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব', 'আজ আমাদের নানা-সুরের উৎসব।' সেই উৎসব-পরিবেশেই সুদর্শনা আধার ঘরের রাজাকে দেখার অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করে। তাই সুদর্শনা বলে 'ওই যে আম্রবনের বীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে, ডাক্ ডাক্ ওদের ডেকে নিয়ে আয় একটু গান শুনি।' গান থেকে সুদর্শনা পেয়ে যায় চোখে-দেখা, কানে-শোনা ঘুচিয়ে দেবার শিক্ষা।

'অচলায়তন' নাটকের আরম্ভেই পঞ্চকের গান শুনে মহাপঞ্চক ক্ষেপে গিয়ে বলে, 'গান! আবার গান!'

চতুর্দিকব্যাপী জড়তার মধ্যে বাস করে অথচ পঞ্চক অনুভব করে 'আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে... আমার সমস্ত শরীরটা গুন গুন করে বেড়াচ্ছে।'

'ফাল্গুনী' নাটকে 'গানের চাবি দিয়েই এর এক একটি অঙ্কের দরজা খোলা' হয়েছে।

'মুক্তধারা'-য় যন্ত্ররাজ বিভূতির বিরুদ্ধতা করে, প্রতিবাদ করে ধনঞ্জয় গান গেয়ে।

'রক্তকরবী'- নাটকে জালবন্দী রাজার আছে মাটির তলায় চাপাপড়া মরা ধন। বন্দী রাজা গান শুনতে ভয় পায়। বিপরীত দিকে রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলে গান গেয়ে। একদিকে মৃত ঐশ্বর্যের পিন্ড, অন্যদিকে সপ্রাণ ফসল-' পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারি ডাক।'

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র নাটককে ঐতিহ্যের সাথে যুক্তিকরণ

রবীন্দ্র নাটককে ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করে দেবার প্রয়োজনবোধের মধ্যে নিহিত রয়েছে গান ব্যবহারের একটি মৌলিক কারন। যাকে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী শান্তি পর্ব বলেছেন। সেই সময়ই রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন নিজের নাট্যাদর্শ ও মঞ্চভাবনা। সেই মঞ্চাদর্শ ও নাট্যাদর্শ গড়ে উঠেছে দেশজ রীতির উপর 'varnacular tradition' এর কাঠামোর ভিত্তিতে। 'রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা আমাদের জাতীয় নাট্যরীতির প্রায় সবই পেলাম–তত্ত্ব, সংগীত প্রাধান্য, গানের দল ,আসরে অভিনয় উপযোগী নাট্যরীতি এবং প্রতিকধর্ম।' এলো বিবেকের মতো ঠাকুরদা বা দাদাঠাকুর, এলো বাউল বৈরাগী, ভ্রাম্যমান গায়ক, সাথে সাথে এলো গানের ধারা। তাঁর নাটককে ঐতিহ্যের উপরে প্রতিপাদ্য করে গভীর প্রয়োজন বোধে রবীন্দ্রনাথ নাটকে গান ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন 'আজও দেখতে পাই বাংলা সাহিত্যের গান যখন তখন যেখানে সেখানে অনাহুত অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না।' এতে অন্যদেশীয় অলংকার শাস্ত্র সম্মত রীতিভেদ হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের রীতি আমাদের স্বভাব সংগত। তাকে ভৎসর্না করা যায় না। আমাদের আদর্শ আমাদের নিজের মন আপন আনন্দের তাগিদে স্বভাবতই সৃষ্টি করবে। 'বিদেশী অলংকার শাস্ত্র পড়বার বহু পূর্ব থেকে আমাদের নাট্য, যাকে আমরা যাত্রা বলি সে তো গানের সুরেই ঢালা।' পাশ্চাত্য অলংকার শাস্ত্র সম্মত নাটক রচনা কালে উত্তরাধিকারলব্ধ সাংগীতিক ভাবনা ভিন্ন রুচির উচ্ছাসকে বাঁধা দিয়েছে, তেমনি উদাহরণ পাই আমরা **'রাজা ও রানী'** এবং **' বিসর্জন '** নাটকে। তারপর যখন নাটক রচনায় আয়ত্ব করে নিতে চেয়েছেন দেশজ ঐতিহ্যকে তখন সেই সাংগীতিক স্বভাব রবীন্দ্রনাটকে আত্মপ্রকাশ করেছে কুণ্ঠাহীনভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের নির্যাস হিসাবে রবীন্দ্রনাটকে গান

কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ 'জীবনের নির্যাস হিসেবেই গানকে বুঝে' নিতে চেয়েছেন, আর তখন 'গান তার নাটকের বিন্যাস মাত্র নয়, নাটকের বিষয়ও বটে' তত্ত্বগত বিচারে রবীন্দ্রনাটকে ঘুরে ফিরে নানান মূর্তিতে একটি বিষয়ই আসে - জড়শক্তির সাথে প্রান শক্তির বিরোধ এবং পরিনামে প্রান শক্তির জয়। তার নাটকে জড়ত্ব যেমন নানা বন্ধনের মধ্য দিয়ে রূপ গ্রহন করে তেমনি প্রানও আত্মপ্রকাশ করে বিচিত্র ছদ্ম বেশে। **'প্রকৃতির প্রতিশোধ'** নাটকের সন্ন্যাসী ছিল শুষ্ক তপস্যার গন্ডিতে বন্দি, **'রাজা ও রানী'** নাটকের নায়ক বিক্রমদের রূপতৃষ্ণা ও কর্তব্যচিন্তা রহিত প্রেমের শৃংখলে অবরূদ্ধ। **চিত্রাঙ্গদা'র** অর্জুন প্রথমে ছিল ব্রহ্মচর্যব্রতের বন্ধনে স্বেচ্ছাবন্দী, পরে হয়েছিল নারীর লালিত লোভনলীলার কুসুমের কারাগারে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে প্রত্যাপাদিত্যের বন্ধন তার রাজ্য। ধর্মের যুক্তিহীন, হৃদয়হীন আচার অনুষ্ঠান, গোড়ামী - এগুলোও বন্ধন **'বিসর্জন '**- এ **'মালিনী'**, **'নটির পুজা'** এবং অচলায়তন' এ । আধুনিক কালের বন্ধন যান্ত্রিকতার, অর্থনৈতিক বৈষম্যভিত্তিক জাতিভেদের তাকেই রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন **'মুক্তধারা'** ও **'রক্তকরবী'**তে'। **'ফাল্গুনী'** তে রূপায়িত হয়েছে কালের বন্ধন। তার অন্যনাম জবার বন্ধন। এই বন্ধনের প্রতিপদে মুক্তির ইশারা রবীন্দ্রনাথের নাটকে আসে প্রেমের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির উদার শ্যামল সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে। গানের সুর স্রোতের মধ্য দিয়ে।

নাটকের অন্তর্নিহিত দাবী গান

রবীন্দ্রনাটকের গানগুলো যে কোন একটি বিশেষ নাটকেই ব্যবহৃত হয়েছে তা নয়, কারণ নাটকের অন্তর্নিহিত দাবীতেই একই গান ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন ভাবে। আবার অন্যকোন সময়ে বা কারণে রচিত গান পরবর্তীতে কোন নাটকে যুক্ত করেছেন সেই নাটকের প্রয়োজনে। যেমন-

'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে'

Dhaka University Institutional Repository

-গানটি রচিত হয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে। কিন্তু **'শারদোৎসব'**- এ ব্যবহৃত হয় ১৩২৯ সালের ভাদ্র মাসে।

'আমার আর হবে না দেরি',

-এই গানটি রচিত হয় ১৩১৪ সালে। কিন্তু এটি **'অরূপরতন'** নাটকে যুক্ত হয় ১৯২০ বঙ্গাব্দে। প্রথমে এটি ছিল গানের দলের গান, পরে হয় সুরঙ্গমার গান।

১৩২১ বঙ্গাব্দে লেখা 'ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়'- **'গুরু'** নাটকে সংযোজিত হয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। এক সময়ে এই গান আবার **'নটীরপূজা'**-নাটকের অভিনয় কালে ব্যবহৃত হয়েছিল।

'খেলাঘর বাধতে লেগেছি'-

রচিত হয় ১৩২৯ বঙ্গাব্দে,

'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে'- লেখা হয় এক বছর পরে। এই দুটি গানই কয়েক বছর পর ১৩৩২ বঙ্গাব্দে **'গৃহ প্রবেশ'**- এ

অন্তর্ভূক্ত হয় হিমির প্রাণ হিসেবে।

'আমরা লক্ষী ছাড়ার দল'- গানটি রচিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দে, তার আটত্রিশ বছর পরে তা ব্যবহৃত হয় **'বাঁশরি'** নাটকে।

১৯১১ সালে **'অচলায়তন'**- এর জন্য লেখা গান 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।' অনেক বছর পরে 'তাশের দেশ'- নাটকে স্থান পায়। আবার 'হারে রে রে রে রে, আমায় ছেড়ে দেরে দে রে'-গানটিও একসময় **'তাসের দেশ'**- এর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' লিখিত হয় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে এবং এটি **'শাপমোচন'**-এর অন্তর্ভূক্ত হয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে।

এগারো বছরের ব্যবধান রয়েছে 'খরবায়ু বয় বেগে'-রচনাকাল ও **'তাসের দেশ'**-এ এই গানের ব্যবহার কালের মধ্যে। ঠিক সেই রকম ব্যবধান 'ওরে ঝড় নেমে আয়'-গানের রচনাকাল এবং চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের সংযোজনার মধ্যে। অনেক সময় অন্য উপলক্ষে লেখা গানও পরে নাটকে জায়গা পেয়েছে। যেমন-

'সর্বগর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ'- এই গানটি রচনা করেছিলেন যতীন দাসের শহীদত্ব বরণের সংবাদ শুনে পরে এই গানটি আবার **'তপতী'**-র অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এই সকল কারণেই অনুমান করা যায় যে, নাটকের অন্তর্নিহিত দাবীতেই রবি ঠাকুর গানের ব্যবহার করেছেন, স্থান-কালের বিবেচনায় নয়।

রবীন্দ্রনাটকে গান, চরিত্রের স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রকাশ

রবীন্দ্রনাটকের গান যেভাবে আসুক, সেই নাটকাবলীতে বেশীরভাগ গান পাত্র-পাত্রীর স্বোচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গাওয়া ।**'প্রকৃতির প্রতিশোধ'** এ কৃষকগণ গান গেয়ে ওঠে 'হ্যাদে গো নন্দরাণী' সেই রকমভাবে গান গায় একদল মালিনী এবং বৃদ্ধ ভিক্ষুক। এই রকম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গানের উদাহরণ অজস্র- যেমন **'বিসর্জন'** এর দ্বিতীয় অংক তৃতীয় দৃশ্যে স্বগতোক্তির পর জয়সিংহের গান 'আমারে কে নিবি ভাই, সপিতে চাই আপনারে'। এই স্বগতোক্তিমূলক গান যেন জয়সিংহের অব্যবহিত আগের স্বগতোক্তির একটি সংগীত ভাষ্য।

'শারদোৎসব' এর বেশীরভাগ গান এই ধরনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত-

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে'

'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া'

'তোমার সোনার থালায় সাজাবো আজ'

ইত্যাদি

'প্রায়শ্চিত্ত' এ বসন্ত রায় ও ধনঞ্জয়ের সব গানই প্রায় এই রকম। **'রাজা', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', রক্তকরবী'** ও তাই। রবীন্দ্রনাটকের বেশীরভাগ স্বত:প্রণোদিত। কিছু চরিত্র থাকে গান যাদের অস্তিত্বের ভাষা, যে কোন অজুহাতেই তারা গানের মধ্য দিয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে এবং স্বত:প্রবৃত্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই রকম চরিত্র

'শারদোৎসব' এর 'ঠাকুরদা,

'প্রায়শ্চিত্ত' এর বসন্ত রায় ও ধনঞ্জয়,

'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা ও সুকামো,

'অচলায়তন' এর পঞ্চক,

'মুক্তধারা'-র ধনঞ্জয়,

'রক্তকরবী'-তে বিশু এবং

'তপতী'-তে বিপাশা।

Dhaka University Institutional Repository

যে সব মানুষ বাউল বৈরাগীর মত আত্মভোলা, সংসার থেকেও সংসারের বাইওে, তারাই আপনা থেকে গান গেয়ে আমাদেও বাক্য থেকে নিয়ে যায় অনির্বচনীয়তার দিকে- নিয়ে যায় অসীম ও সীমাবদ্ধেও মধ্যবর্তী এক ভূখন্ডের দিকে।

নাটকের আবহ রচনায় গান

রবীন্দ্রনাটকের কিছুগান আবহ রচনায় সাহায্য করে। গানের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায় নাটকের পটভুমি ও পরিস্থিতির আবহমন্ডল। 'বিসর্জন' নাটকে পুরবাসিগনের গান

'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে'

রক্ত পিপাসু ত্রিপুরেশ্বরীর পূজার মঞ্চপরিবেশ দর্শকের মনে সঞ্চার করে। **'শারদোৎসবে'** এ সব গানই শরৎকালীন আবহ রচনা করেছে, তবু বিশেষ করে উল্লেখিত গান গুলিতে প্রসন্ন পরিবেশ সংগীতে বিনিময় ও মূর্তমুখর হয়ে উঠেছে-

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে'
'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া'
'আমরা বেধেছি কাশের গুচ্ছ'
'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দমধুর হাওয়া'

এই নাটকের বেশিরভাগ গানের আশ্রয় রাগরাগিনী সমূহ যেমন-**বিভাস, সিন্ধু, ভৈরবী, ললিত, রামকেলি-শেষরাত্রি** উষা প্রভাতের আভাস এনে দেয়। ফলে সময় নাটকে মেঘমুক্ত মালিন্যমুক্ত প্রভাতের স্নিগ্ধ পবিত্র প্রসন্নতার পরিমন্ডল আমরা পাই।

'রাজা' নাটকে বসন্ত ঋতুর পরিবেশ গানের কথায় এবং বাহারের সুরে সুরে অমরত্ব লাভ করেছে। যেমন

'আজি দখিন দুয়ার খোলা'
'আজি কমল মুকুল দল খুলিল'
'পুষ্প ফোটে কোন কুঞ্জবনে'
'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে'

Dhaka University Institutional Repository

এই সকল গান এক অনুকুল বাসন্তী পরিবেশ রচনা করে। অচলায়তনের চার দেয়ালের বাইরে যে প্রানবন্ত জীবন আছে, যে জীবন প্রকৃতির সংসর্গে প্রানবান ও কনিষ্ঠ সেই জীবনে আবহমন্ডল রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন শোন পাংশুদের কণ্ঠের এই সব গানের মাধ্যমে।

'রক্তকরবী' নাটকে **'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে '** এ প্রারম্ভিক গান ও 'শেষ ফলনের ফসল এবার' এই অন্তিম গান ব্যাবহৃত হয়েছে কেবল আবহরচনার কারনেই।

গানের মধ্যদিয়ে নাটকের আবহরচনায় রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন **'মুক্তধারা'** নাটকে। ভৈরব মন্ত্রে দিক্ষিত সন্ন্যাসীদের স্তবগান **'জয় ভৈরব, 'জয় শঙ্কর'** এবং যন্ত্রবন্দনার গান **'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র,নমো যন্ত্র'**, **'মুক্তধারা'** নাটকের পরবর্তী নাট্য উপযোগী আবহমন্ডল রচনায় গভীরভাবে আনুকূল্য দিয়েছে।

তাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই আবহনির্মানের গুরুত্ব অনেক বেশি। সেই দায়িত্ব তিনি প্রত্যক্ষত নেননি বটে কিন্তু বস্তুত কোন কোন গানের কথা ও সুরের সমন্বয় এমন একটি জটিল প্রত্যাঘাতপূর্ন আবহ সঞ্চার করে যার রেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে নাট্যঘটনায়। ঠিক স্পষ্ট বোঝা যায় না এমন এক অনুভূতি তৈরী হয়, যার ঘূর্ণিস্রোতে ঘটনার যথার্থ পরিবেশ রচিত হয়, নাটকের আবেদনও একটা স্থির লক্ষের পরিপূর্ণতা পেয়ে যায়। নাটকের বক্তব্যকে কোন একটি কেন্দ্রে স্থির রাখবার জন্য অথবা আবহরচনায় সুযোগ্য কারণে রবীন্দ্রনাটকে কোন কোন গান প্রয়োগের যথার্থ তাৎপর্য পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকে ব্যবহৃত গানের বৈশিষ্ট্য

রবীন্দ্রনাটকের গান বিশ্লেষণ করলে এর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক দিয়ে একাধিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বিশেষ করে এর প্রায়োগিক গুণাবলীর কারণেই রবীন্দ্রনাটকে ব্যবহৃত গানকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়ে। নিবলিখিত অংশে সেই বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো

রবীন্দ্র নাটকে গান অনির্বাচনীয়তার আভাস

'রক্তকরবী'- নাটকে বিশুর গান সম্বন্ধে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন 'বিশুর গান শুনতে পাওয়া যায় বিশুর মনের একটা অব্যক্ত অংশ, যা সঙ্গে সঙ্গে অনির্বচনীয় বটে, যা প্রকাশ করতে গেলে গান ছাড়া অন্য ভাষা বাতুল হয়ে যায়।'

শুধু বিশুর গানে নয়, রবীন্দ্রনাথের উত্তর পর্যায়ের নাটকে আছে এরূপ বাক্যের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা।

'ফাল্গুনী'- নাটকে বাউল বলেছিল, 'আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়-সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।' রবীন্দ্র-নাটকের গান সেই অনির্বচনীয়তার দিকে নিয়ে যায়, বাক্যের সৃষ্টিকে পিছনে ফেলে ছাড়িয়ে যেতে হবে। তার নাটকে কখনো কখনো গানের রস অনির্বচনীয়তার আভাস দেয়। এদিক দিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী নাটক **'ডাকঘর'**। **'ডাকঘর'**-এ কোন গান নেই, কিন্তু এতে অনির্বচনীয়তার আভাস গান সংবলিত নাটকের চেয়েও যেন বেশী। গান না থাকা সত্ত্বেও **'ডাকঘর'** গদ্যনাট্য যেন আদ্যপান্ত গান। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজেই একে **'গদ্যলিরিক'** বলেছিলেন এবং **'ডাকঘর'** এর গদ্যলিরিকে এনেছিলেন অন্তর্লীন সুর। তাই এই নাটকে আলাদা করে গান না থাকলেও আছে অনির্বচনীয়তা। **'ডাকঘর'** রচনার বেশ কিছুদিন পরে তিনি লিখেছিলেন, 'কখনো কখনো গদ্যরচনার সুরসহযোগ করবার ইচ্ছা হয়।'

Dhaka University Institutional Repository

'গীতবিতান'- এর গ্রন্থ পরিচয় থেকে জানা য়ায় **'শাপমোচন'**-এর বিভিন্ন অভিনয় উপলক্ষে রাজার ও রানীর কিছু কিছু গদ্যসংলাপে সুর দেয়া হয়েছিল। যেমন চন্ডালিকা গদ্য সংলাপে সুরযোজনা করে নৃত্যনাট্যে রুপান্তরিত করেছিলেন।

'চন্ডালিকা' গদ্যনাট্য ।। ছি ছি মা, আবার তোকে বলছি, ভুলিস নে, মিথ্যে

নিন্দে রটাস নে নিজের-পাপ সে পাপ। রাজার
বংশে কত দাসী জন্মায় ঘরে ঘরে, আমি
দাসি নই। ব্রাহ্মনের ঘরে কত চন্ডাল জন্মায়
দেশে; আমি নই চন্ডাল।

'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্য ।। ছি ছি মা, মিথ্যা নিন্দা রটাস্ নে নিজের
সে যে প'প
রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য
আমি সে দাসী নই।
দ্বিজের বংশে চন্ডাল কত আছে
আমি নই চন্ডালী।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণাঙ্গ গান-দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করে ব্যবহারের প্রবণতা

রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক গুলিতে চরিত্রের মুখে একটা পূর্ণাঙ্গ গান গাওয়ার দৃষ্টান্ত বশি। সমস্ত ঘটনা ও সংলাপ থামিয়ে দিয়ে **'রাজা ও রাণী'**-তে ইলা গান গায় 'এরা পরকে আপন করে, আপনারে পর' অথবা 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি'।

'শারদোৎসব'-এর দশটি গানের মধ্যে দুটি গান বাদে সবগুলো গানের পুরোটাই একসঙ্গে গাওয়া। **'রাজা' ,'অচলায়তন',** মুক্তধারা'-ও সব গানই এই রকম নাট্য ব্যাপারকে থামিয়ে দিলে গাওয়া। কিন্তু নাট্য ব্যাপারকে এইভাবে থামিয়ে দিলে সহ অভিনেতাদের স্বস্তিহীন বিব্রত অবস্থার সম্ভাবনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি অনেক সময় সংলাপের মধ্যে একই গানকে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন- **'শারদোৎসব'** এ 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' গানটি ঠাকুরদা ও বালক দলের কথোপকথনের মধ্যে তিনটি অংশে বিন্যস্ত- প্রথমে স্থায়ী, তারপর অন্তরা, তৃতীয় অংশে সঞ্চারী ও আভোগ।

'রাজা' নাটকে ঠাকুরদা একবার কথা বলছে স্ত্রীলোকদের দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার সঙ্গে আর তারই ফাকে গাইছে 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়' গানের স্থায়ী অংশ একবার অন্তরা অন্যবার।

'অচলায়তন'- এর তৃতীয় দৃশ্যে পঞ্চকের গান 'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেরেছে'-ও ক্ষেত্রেও দেখি গানটি পঞ্চক মহাপঞ্চকের সংলাপের দ্বারা তিন টুকরোয় খন্ডিত।

'রক্তকরবী'-তে বিশুর গান কিছু পুরোটাই একসঙ্গে গাওয়া, কিছু গান দুই বা ততোধিক খন্ডে ভেঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। নলিনী প্রথমে 'ভালোবাসি ভালোবাসি' গানের দুই চরণ মাত্র গেয়েছে। তারপর নেপথ্যকারী রাজার সঙ্গে চলেছে তার দীর্ঘ সংলাপ, তারপর আবার গেয়ে শেষ করেছে গানটি- তখনো গানটি রাজার সংলাপের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত।

প্রথমদিকে রচিত নাটকের পাত্র-পাত্রী অখন্ড গান গেয়েছে, ক্রমে পাত্র-পাত্রীর গান হয়ে ওঠে সংলাপের দ্বারা বিযুক্ত এবং যুক্ত, সংলাপের মধ্যে খচিত বিভিন্ন টুকরোর ছড়ানো।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের গানে কোরাসের ব্যবহার

গ্রীক নাটকে কোরাস খুবই বড় এক বৈশিষ্ট। অনেক সময়ই এর প্রয়োজন নাট্য বিরতি হিসাবে অথবা দৃশ্য বিভাগের বিকল্প রাগে। অন্যদিকে এই কোরাস ব্যবহারের আরো কিছু প্রয়োজনও ছিল। যেমন পুরাঘটিত ঘটনার বিবৃতি, ঘটনার জটিলতা বা চরিত্র তাৎপর্যের ব্যাখ্যা বা সাধারনীকরণ, প্রায়ই সমাপ্তিতে নাট্য বিষয়ের নীতিকথা উচ্চারণ, কিংবা ঘটনাপ্রবাহে দর্শকমনে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার বাণীলিপি। বিশেষত এই শেষ কারনেই কোরাস হয়ে ওঠে, গিলবার্ট মারের বর্ননা মতো,**'আইডিয়াল স্পেক্টেটর'**।

রবীন্দ্র নাটকের গানের এই কোরাস ধরনের ব্যবহারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরন আছে নৃত্যনাট্য **'শ্যামা'**য়। এই নৃত্যনাট্যে সখিদলের ভূমিকা মনে পড়তে পারে এই প্রসঙ্গে। বজ্রশেনের ক্রুদ্ধ আঘাতে শ্যামা যখন ভুপতিত তখন ভেতর থেকে ভেসে আসে মন্তব্য গান- **'হায়! এ কী সমাপন'** সখীদলের এরূপ উচ্চারণ সর্বজ্ঞা এবং সেই কারণে সর্বত কাব্যশ্রষ্ঠার পক্ষেই বলা সম্ভব, যার অমোঘ টানে শেষ পর্যন্ত নেপথ্যের উচ্চারণ জানতে পারি আমরা।

অমৃত পাত্র ভাঙিলি
করিলি মৃত্যুরে সমর্পন
এ দূর্লভ প্রেম মূল্য হারাল
কলঙ্কে, অসম্মানে

প্রথাগত নাটকেও আমরা গানের কোরাস ধরনের ব্যবহার পাই। **'রাজা ও রানী'**র তৃতীয় অংক দ্বিতীয় দৃশ্যে কুমার চলে যেতে চাইলে সখীদের গান যেন কোরাস মন্তব্য-**'যদি আসে তবে কেন যেতে চাই?'**

মুক্তধারা নাটকে রাজার নির্দেশে সেনাপতি বিজয়পাল যখন অভিজিৎকে রাজ শিবিরের পথে নিয়ে গেল তখন বাউল যে গান **'ও তো ফিরবে নারে, ফিরবে না আর ফিরবে নারে,'** তা যেন কোরাসের বিকল্প। **'নটীর পুজা'** নাটকে 'হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বী' গানে এবং 'গুরু' আর 'অরূপরতন' এর অন্তগীতির প্রায় নীতিকথনে কোরাসের সঙ্গে ঈষৎ প্রয়োগ গত সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকের থিম গান

আরো কিছু গান আছে রবীন্দ্র নাটকে। যাকে থীম গান বলা যেতে পারে। এই সব গানের মধ্যদিয়ে নাটকের থীমের সারাংশ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

কৌতুক নাট্য **'গোড়াই গলদ'** এর শেষ গান **'যার আদৃষ্টে যেমনি জুটুক'** এই রকম থীম গান। **'শারদোৎসব'**-এ ঠাকুরদাদার গান 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজীবন'-থীম গান বলা যেতে পারে। আবার রাজা নাটকে থীমগান একটি নয় একাধিক।

যেমন

'আমার প্রানের মানুষ আছে প্রানে'
'আহা তোমার সঙ্গে আমার প্রানের খেলা'
'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না'
'এ অন্ধকার ডুবাও আমার অতল অন্ধকারে'
'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে'

এইসব গানকেই থীমগানের মর্যাদা দেওয়া চলে। এই সকল থীম গান আছে **'অচলায়তন'** এ মুক্তধারায়। গৃহপ্রবেশে হিমির 'জীবন মরনের সীমানা ছাড়ায়ে', **'তপতি'** তে দেবদত্ত ও উপাসকগণের সর্বখর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ', **'তাশের দেশ'** -এর সমবেত গান 'ভাঙ্গো বাধ ভেঙ্গে দাও, বাধ ভেঙ্গে দাও'- এই রকম থীম গান।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকে গান এক গভীর অন্তনাট্য

রবীন্দ্রনাটকের গানের মধ্যে কখনো থাকে এক গভীর অন্তনাট্য। বিশেষ করে যেসব নাটকে বিশেষ অর্থে রাবিন্দ্রীক নাটক তার গান। বিশেষ করে যে সব নাটক বিশেষ অর্থে রাবিন্দ্রীক নাটক তার গান 'অরূপরতন' নাটকের একটা গানকে নিদর্শন হিসেবে নিতে পারি।

খোল খোল দ্বার
রাখিওনা আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে
দাও সাড়া দাও
এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে

এই গানে আছে প্রভুর উদ্দেশ্যে। রাজার উদ্দেশ্যে সুরঙ্গমের এই তন্ময় আত্মগত সংলাপ। অথবা সুরঙ্গমের গান ' **এযে মোর আচরন/ ঘুচাতে যতক্ষন**', ঠাকুরমার গান ' তোমার সঙ্গে প্রানের খেলা অথবা সুরঙ্গমের অন্য আরেক গান 'ভাইরে মোর আঘাত করো ভীষন হে ভীষন।' এই সকল গানে এক পক্ষের গীত সংলাপের মধ্য দিয়ে আমি-তুমির গূঢ় নাট্যের লীলার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। **'অচলায়ন'** -এর কোন কোন গানে এই অন্তনাট্যের বৈশিষ্ট্য আমরা পাই। যেমন পঞ্চকের **'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া'** গানে।

'নটির পুজা'য় শ্রীমতীর **'হার মানলে, ভাঙ্গিলে অভিমান'** গানে ও এই বৈশিষ্ট্য আছে। উপরের উদাহরণ গুলির মতো অন্তগুঢ় নয়, এক উপরের স্তরের নাট্য আছে **'মুক্তধারা'** ধনঞ্জয়ের গানে- **'রইল বলে , রাখলে কারে'** তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।' কিন্তু রবীন্দ্রনাটকে অনেক গানে আমরা যে অন্তনাট্য খুঁজে পাই, নাটকের বাইরের গানেও তার থাকে বহুল প্রকাশ। আমি-তুমির টানাপোড়েনের বেদনা যাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে এই অন্তগুঢ় গভীর অন্তনাট্য তা যেমন আছে নাটকের কিছু গানে, তেমনি আছে নাটকের বহির্ভূত অনেক গানে।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকের গান চরিত্রের চাবির কাজ করে

রবীন্দ্রনাটকে আরো কিছু গান আছে যা চাবির কাজ করে। সেই গানের চাবি দিয়ে চরিত্রের ভিতরের দরজা গুলো খুলে দেওয়া যায়। আমরা তার সাহায্যে চরিত্রের রহস্যময় মহলে প্রবেশ করতে পারি। **'বিসর্জন'** এ জয়াসিংহ যখন গায়

'আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে'

তখন জয়সিংহের মানসিক পরিস্থিতি আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়। 'রাজা' নাটকে সুরঙ্গমা যখন গায়

'আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগি'

তখনো তার সমর্পিত ভক্তচরিত্রের বিনীত মধুর দিকটি আমাদের সামনে খুলে যায়। **'অচলায়তন'** এ যখন শেনে পাংশুর গান গায়

'এই একলা মোদের হাজার মানুষ'

তখন সেই গান হয়ে ওঠে দাদাঠাকুরের ব্যাখ্যা। **'মুক্তধারা'**য় ধনকুঞ্জয়ের সব গানই আমাদের সাহায্য করে ধনঞ্জয় চরিত্রকে বুঝতে। **'রক্তকরবী'**র বিশুর যে ব্যর্থ প্রেমিকের দগ্ধ উদার চরিত্রের কথা ভাবা হচ্ছে সেও ভাবা হচ্ছে তার গানের ভিত্তিতে প্রধানত।

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য প্রসঙ্গ বিচ্যুত বিশুদ্ধ গান

রবীন্দ্র নাটকের বেশিরভাগ গান নাট্য প্রসঙ্গ বিচ্যুত বিশুদ্ধ গান। সেই গানগুলো উপভোগের জন্য মূল নাটকে পটভূমি না জানলেও চলে। এমন কি গানগুলির যে কোন নাট্যাশ্রিত তাও অনুমান করা কঠিন। **'রাজা ও রাণী'** তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় কুমারসেন সুমিত্রা সম্পর্কে বলে-

'আর কি সে মনে করে'

তখন ইলা সেই উক্তির সাথে সংগতি রেখে গান গায়–

'এরা পরকে আপন করে আপনারে পর–'

এই গানকে নাট্যপ্রসাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি বিশুদ্ধ গান হিসেবে সহজেই সন্তোষ করা যায়। গানটির গায়ে নাট্যচিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। **'রাজা'** নাটকে রাজার প্রসার গান।

'আমি রাগে তোমায় ভোলাব না' গভীর ভাবে নাট্য প্রসঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু নাট্যকনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকেও গান হিসেবে উপভোগ করা যায়– নাট্যস্মৃতি মনে পোষণ করার দরকার হয় না। এই রকম গান অজস্র। **'শারদ্যোৎসব'** এর সব নাম এই রকম।

'আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে'

'শারসোৎসব' এর গান নয়, কোন নাটকেরই গান নয়, কিন্তু এই গানটিকে যেমন বিশুদ্ধ গান হিসেবে উপভোগ করি তেমনি **'শারদোৎসব'**, এর অন্যান্য গানগুলিকেও করা চলে। **'রাজা'** নাটকের তত্ত্বগান পূজাস্পর্শী গান বা বসন্ত বন্দনার গানও এই রকম। সেই রকম **'মুক্তধারা'** **'রক্তকরবী,'** তপতী'র গান। **'গৃহপ্রবেশ'** এ যতীনের একটি মাত্র গান আছে,

Dhaka University Institutional Repository

'ওরে মন যখন জাগলি নারে'–

গানটির শেষে যতীন মন্তব্য করেছে–

'তোরে মাসির কাছে শুনে বুঝেছি হিমি, মজ্জির মন জেগেছে।' এই উক্তির মধ্যদিয়ে গানটিকে নাট্যপ্রকাশে সংগ্রহিত করা হয়েছে। তবুও এর স্বতন্ত্র উপভোগ আছে। নৃত্যনাট্যেও এমন গান পাই অনেক।' **'চিত্রাঙ্গদা'** নৃত্য নাট্যে এই রকম গান সবচেয়ে বেশি –

'ওরে ঝড় নেমে আয়'
'বঁধু কোন আলো লাগলো চোখে।
'ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতল জলের আহ্বান'

ইত্যাদি 'চন্ডালিকা' ও 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে এই রকম গানের উদাহরণ মেলে। বিশুদ্ধ গান হিসেবে রবীন্দ্রনাটকের গানকে যখন স্বতন্ত্র ভাবে উপভোগ করা যায় তখন তার মধ্যে এসে যায় এক ধরনের অ্যাম্বিগুইটি বা দ্ব্যর্থতা- এই দ্ব্যর্থতা আনে ব্যঞ্জনাময় অতিরিক্ত মাত্রাকে আশ্রয় করে। ধরা যাক **'চিরকুমার সভা'** নেপথ্য গান–

'ওগো, তোরা কে যাবি পারে
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে'

খুব কাছের বাড়ী থেকে ভেসে আসা এই গানের তাৎপর্য নাট্য প্রসঙ্গের দ্বারা সীমাবদ্ধ। শ্রীশং বিপিন ও পূর্ণ মিলে সেই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু গানই নাট্যপ্রকাশ থেকে বিচ্যুত হয়ে পেয়ে যায় ব্যাপক তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাটকের গানে এই রকম অ্যাম্বিগুইটির প্রমাণ অনর্গল। সুরমার মুখে দাদামশায় এসে পৌছেছেন শুনে বিভা যখন ভাবছে তিনি আমাদের দেখতে এখনো এলেন না কেন' তখনই অন্তরায় গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে–

'আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে'

নাটকে না নিতান্ত বসন্ত রায়ের মঞ্চপ্রবেশের উপলক্ষ। সেই উপলক্ষ, ঘটিত গান নাটক থেকে সরিয়ে নিজে হয়ে যায় এক ব্যঞ্জনামধুর প্রেমের গান। নাটকে গানের স্বপনতরীর নেয়ে তার সেই সাধের নন্দিনী, কিন্তু নাটকের বাইরে হয়ে উঠতে পারে যে কোন দহিতা রমনী। **'গৃহপ্রবেশ'** এ যতীনের যে গানের কথা আগেই উল্লেখ আছে **'ওরে মন যখন জাগলি নারে'**

Dhaka University Institutional Repository

নাটকে সেটি বিশেষ করে যতীন মনির দাম্পত্য-পরিস্থিতির গান। নাটকের চৌহদ্দির বাহিরে নিয়ে এলে সেই প্রগতি সীমাবদ্ধতা মুছে যায়। নাটকের গান গেয়ে যায় সীমাহীন ব্যঞ্জনা। তা অর্জন করে দেশাতীতের কালাতীতের মাত্রা।

গান কখনো কথার পূর্ণ প্রয়োগ

রবীন্দ্র নাটকে কিছু গান আছে তা যেন কথারই ভাষ্যকার, যেন প্রগলভ ব্যাখ্যা তার অবয়ন ধরে গান, যেমন 'রাজা' বা মুক্তধারা' আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের গান বাদী প্রদান, ফলে তা কেবল সুরের মায়াজালই বোনে না, সেই সঙ্গে একে যায় কথার রেখাও, তেমনি রবীন্দ্রনাটকের গানের কথায় আমরা অতিরিক্ত কিছু পাই যা তার অব্যবহিপূর্ব সংলাপেই ধরা পড়ে। সংলাপের যে বিষয়ের উত্থাপন, সাথে তারই বিস্তার। বিস্তার না বলে কখনো তাকে পুনঃপ্রয়োগ বলা যায়। কেননা পূর্ববর্তী সংলাপে সেই গীতিভাষায় পুরোটাই অনেক সময়ে মিলে যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক-

ধনঞ্জয়। রাজা, ভুল করছ এই যে ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই
জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই থাকে পাও মুঠোর
মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে
ভাবছ, তবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা বিপরীত উদাহরণ ঃ

ধনঞ্জয়। রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
টানাটানি টিকিবে না ভাই
রবার যেটা সেটাই রবে।
রাজা। টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার
শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

আবার অন্যত্র

ঠাকুর্দা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা
দেয় না বলেই তো সময় রাজাটা একেবারে রাজায়
ঠাসা হয়ে রয়েছে– তাকে বল ফাকা! সে যে
আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।
জায়গা ছেড়ে দেয়।
আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে ....
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান
মোদের খাঁটো করে রাখেনি কেউ কোন অসত্যে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।

এসব অংশ বস্তুত একই কথার গদ্য পদ্য দুই ভিন্ন রূপ।

Dhaka University Institutional Repository

নাটকের গান প্রকাশের সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলতে পারি কেবল পরিবেশ রচনার সার্থক ব্যবহার আমরা কখনো বিষয়টি দেশের ঈষৎ প্রয়োজন ভিন্ন অন্ন অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে গান একটা অলংকার হয়ে ওঠে। সংস্করণের পরিবর্তনে বা অভিনয়ের প্রয়োগে গানগুলি যথেষ্ঠ যোজনবর্জনে ও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। আবার কখনো একই মান নাট্যরূপান্তরে হচ্ছে অন্য চরিত্রের গান।

'ঋনশোধ' এ শেখরের তিনটি গান,**'শারসোৎসব'**- শুনি সন্ন্যাসী আর ঝাকুদার মুখে

'আমি রূপে তোমার ভোলাব না'

'অরূপরতনে'- এ আছে সুরঙ্গমার কণ্ঠে, 'রাজা'তে এ গান স্বয়ং রাজার

'অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে।
তোমার কথা ঢাকে যে তার মুখর ঝংকার'

রবীন্দ্রনাট্য গানগুলি কখনো বা শিল্পের লক্ষভূমির বাক্যে শিল্পের আড়াল তৈরী করে দেয়। এখানেও হয়তো কবি ভাবছিলেন।-

'আমার সুরগুলি পায় চরণ
আমি পাই নে তোমারে।'

আবার এমন ভাবাও অসংখ্য যে গানগুলির দ্বারা নাট্যরস কখনো ক্ষুন্ন হলেও তার দ্বারা কার্যহীন হয়েছে বাক্যসৌন্দর্য। মেটার লিঙ্ক প্রকাশে এলিয়েট বলেছিলেন।

'In failing to be dramatic (he) failed also to be paitic'

Dhaka University Institutional Repository

তেমনি এখানে বলতে পারি, যে সমস্ত অংশ নাটক হিসেবে সুন্দর নয় তা বাক্য হিসেবেও ততটাই অগ্রাহ্য। সন্দেহ নেই যে, রবীন্দ্রনাথ এসব রচনার দেশীয় চিত্তের অনুকূল এক সাংগেতিক কাঠামো প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দেখতে হবে যে সেটা শিল্প অভিপ্রায় অতিক্রম করে মোহমাত্রে পর্যবসিত হল কি না।

এই মোহরচনা রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল ছিল না, কিন্তু ক্রমে তিনি তার বশে এসেছিলেন। আবার এর থেকে মুক্তির একটা ছোট ইশারা মেলে **'মুক্তধারা'**র পর। প্রহসন **'চিরকুমার সভা'** এবং রূপক **'তাদের দেশ'** এর ব্যতিক্রম বাদ দিলে পরবর্তী নাটকে গানের সংখ্যা বহুল পরিমানেই কমে যায়। **'মুক্তির উপায়'** এ দুটি, **শোধবোধ** এ তিনটি, **বাঁশরীতে** পাঁচ, **রক্তকরবী**'তে আট, **'গৃহপ্রবেশ' 'শেষ রক্ষা'** এবং **'তপতী'**তে গানের সংখ্যা নয়। **'নটীর পূজা'** গানের আলেখ্য, সেখানে গান বারোটি। এর কাছে তুলনায় প্রাঙ্গন যুগ; **'প্রায়শ্চিত্য'** তে চব্বিশ, **'রাজা'**য় ছাব্বিশ, **'অচলায়তন'**-এ তেইশ আর **'ফাল্গুণী'**তে গান আছে তিরিশটি।

'মুক্তধারা' যুগে গানের এই অপ্রতুলতা একেবারে কারণ হীন ছিলনা। একদিকে যেমন এ সময় অধ্যাত্ম-পক্ষ থেকে মুক্ত, অন্যদিকে তেমনি এর সমকালে ১৯২৩ সালে তৈরী হল **'বসন্ত'** পালানাট্য- অথবা বলা যেতে পারে পালা গান। তারপর অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে আমরা পাই **'শেষবর্ষন' 'নবীন'** বা **'শ্রাবণ ধারা'**। এই রচনাগুলিতে কবি তার গানকে ক্রমে একটা ব্যবহারিক মুক্তি দিতে পেরেছিলেন। যে প্রমোদের প্রয়োজন অনেক সময়ে সংগীতকে নাটকের অন্তর্গত করে, তাকে তৃপ্ত করবার মতো অন্য এক আয়োজন দেখা দিল রবীন্দ্র রচনার সমৃদ্ধ ভান্ডারে। ফলে তার জীবনের অবসান ভার্সে **'বসন্ত' 'নবীন'** প্রমুখ গীতিসম্ভার একদিকে গানকে নাটক থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে একটা গীতি **'প্রয়োগে'** পরিণত করেছে।

অন্যদিকে নাচ-গান অভিণয় বহুযোগে যে পূর্ণাঙ্গ নাটক রবীন্দ্রকল্পনার গভীর আদেশে ধরা দিয়েছিল তার রূপ দেখা দিল **'নটীর পূজা**'র মধ্য দিয়ে নৃত্যনাট্যাবলীতে। সংলাপের অন্তর্গত যে সুরের ইঙ্গিত আমরা পুরানো আলোচনায় লক্ষ করেছি, সেই সুরকে গান এবং কথার মধ্যে বিচ্ছিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

করে দেওয়ায় তাঁর রচনা প্রতিদিন ছিল যেন' দ্বিধাগ্রস্থ। কিন্তু জীবনের উপান্ত, সেই দ্বিধাদূর হলো, সম্পূর্ণ সুরারোপে, সম্পূর্ণ গীতিব্যবহারে এবং তাঁর নাটকের সংলাপ হল সম্পূর্ণ গান আর সেই গানের অভিণয় হলো পূর্ণাঙ্গ নৃত্য। রবীন্দ্রনাটকে গান এতোদিনে লক্ষ্যের সমুদ্রে পৌছেছিল। কুল থেকে তার গানের তরী ভেসে গেল।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নাট্য সংগীত রচনায় সুরের প্রাধাণ্যতা

বিশুদ্ধ সংগীতের বিচার যেমন হয় সুরের বিন্যাস দিয়ে, কিংবা কথা-সুরের সংগতির প্রশ্নটি যেমন বড়ো হয়ে ওঠে গানের মূল্যায়ণ এ সঙ্গে, নাটকের গানের বিচার ঠিক সেভাবে করা যায় না কখনোই। শুধু কথার গৌরব, বা নিছক সুরমাধুর্য একেবারেই বড়ো নয় নাটকের গানে, এমনকি কথাসুরের সামঞ্জস্যের সৌন্দর্যও নাট্য-বিচ্ছিন্ন ভাবে জরুরি নয় তেমন। নাটকে গান মূল্য পায় নাটকীয় তাৎপর্য্যে, নাট্যবিষয়ের সঙ্গে একাত্মতায়। তাই নাটকে গানের নিজস্ব সৌন্দর্য্য সন্ধানের পরিবর্তে আমরা মনোযোগি হয়ে উঠি নাটকীয় মুহূর্ত আর গায়ক চরিত্রের সঙ্গে গানটিকে মিলিয়ে নিতে, আর তারই সঙ্গে দেখে নিতে চাই কথা ও সুরে গানের সম্পূর্ণ হয়ে ওঠাকে।

লক্ষ্য করতে ভালো লাগে যে রবীন্দ্রনাথের নাটকের অধিকাংশ গানই কথা-সুরে তালে সম্পূর্ণ, অর্থাৎ এগুলি **'গান'**, এবং নাটকের গান। সেই কারণে একই গান ভিন্ন তাৎপর্য পেয়ে যায় নাটকে, আর নাটক বিযুক্ত স্বতন্ত্র গান হিসেবে। **'গীতবিতান'** এ শীতঋতুর গান **'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'**, বা প্রেম-পর্যায়ের গান **'তোমায় গান শোনাব' 'রক্তকরবী'** নাটকে পায় নতুন মাত্রা, অন্যতম ভাবব্যাঞ্জনা।

কিন্তু এই সঙ্গে অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয়, এই যে ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন মূল্য, এ তো গানের কথাই পায় কেবল, সুরও কি পায় এরকম বৈচিত্র্যময় মাত্রা । নাটকে গানকে যদি আমরা ধরে নিই সংলাপেরই ভিন্নতর রূপ, তা হলে গানের কথাই প্রাথমিকভাবে বেশি গুরুত্ব পায় সন্দেহ নেই। তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না **'ও চাঁদ চোখের জলের লাগল জোয়ার'** গানটি কেন সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয় নি এই নাটকে; বিশুদ্ধ বক্তব্য সম্পূর্ণ হবার সঙ্গেই থেমে গিয়েছে গান। সুরের কি তবে নাটকে, আর নাটকের বাইরে ভিন্ন কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয়, গানের কথাকে তো সুরই পৌঁছে দেয় । আর তখনই ধারণা করা যেতে পারে যে গানটি সাধারণত যেমন ক'রে গাওয়া হয় বিশুর গান হিসেবে ঠিক সেই ভাবে গাওয়া হবে না নিশ্চয়ই। বিশু গায়ক হলেও এ তো শুধু গান নয়, এ নন্দিনীর প্রশ্নের জবাব, কিংবা তাও নয়, নন্দিনীর জিজ্ঞাসাকে উপলক্ষ মাত্র ক'রে এ বিশুর প্রেমিকচিত্তের নিভৃত বেদনার উদঘাটন। সুরের ভাষায় এর প্রকাশ যথার্থ

Dhaka University Institutional Repository

হলেও এই গানগাওয়া একটু আলাদা হতেই হবে। আর গাইবার ধরনেই গানের কথার মতো সুরও পাবে নতুন কোনো মাত্রা দুই শব্দের মধ্যবর্তী বিরতিতে বা সুরের স্থায়িত্বের তারতম্যে ।

একটু ভিন্ন উদাহরণ গানের এই প্রসঙ্গকে আর স্পষ্ট করবে। **'রক্তকরবী'** নাটকের এক অভিণয়ে গানটি আরম্ভ হয়েছিল গানেরঅন্তরা থেকে– **'আমার তরী ছিল চেনার কুলে'**। স্বতন্ত্র গান হিসেবে এভাবে গাওয়া প্রত্যাশিত নয় বলা বাহুল্য, কিন্তু নন্দিনীর **'কোথায় তুমি গেলে বলো তো'**– এই প্রশ্নের উত্তরে যখন শুনি, **'আমার তরী ছিল চেনার কুলে'**– তখন সমস্ত পরিবেশটি হয়ে ওঠে আশ্চর্য প্রাণময় প্রশ্ন-উত্তরে গাঁথা । সংলাপের ধরণ বলে নয়, সুরের দিক দিয়েই প্রয়োগের ধরণটি আমাদের ভাবিয়ে তোলে। নন্দিনীর প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই সুর বা স্বরের যে জায়গায় শেষ হওয়া সংগত বলে কল্পনা করি, গানের অন্তরার চড়া সুরটি যেন তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের মনকেও বেঁধে দেয় উদাস ঔদার্যের সুরে। গানের ভিতর দিয়েই, কিন্তু গানকে অতিক্রম করে বিশুর ব্যর্থ প্রেম, তার প্রচ্ছন্ন মর্মবেদনা আমাদের কাছে সত্য হয়ে ধরা দেয়।

এই গান প্রয়োগের এটিই একমাত্র বা চূড়ান্ত আদর্শ এমন নয়, কিন্তু দেখা যায় উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে গানের কথার মতো সুরের মূল্যও বদলে যেতে পারে, যেমন যায়, বিভিন্ন গায়কের গায়ন ভঙ্গির স্বাতন্ত্রে। একেই বলা যায়, 'সুরকারের সুর বজায় রেখেও এক্সপ্রেশনে'র বা 'ইন্টাপ্রেপেটশনের স্বাধীনতা', যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দেবার কথা ভেবেছিলেন তাঁর গানের গায়কদের।

অবশ্য এ হল একেবারেই গানের প্রয়োগগত ভাবনার কথা। তা হলেও নাটক এবং গান-দুটিই প্রয়োগনির্ভর শিল্প বলে নাটকের গানের ক্ষেত্রে এ কথাটি বিশেষ করেই মনে রাখবার।

এই প্রসঙ্গেই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের নাটকে এমন গানও আসে কখনো কখনো,যা **'গান'** হিসেবে সম্পূর্ণ হয়েও সুর নাট্যপ্রয়োগের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের মনে পড়বে

'অচলায়তন' নাটকে-
'দূরে কোথায় দূরে দূরে',
'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া',

Dhaka University Institutional Repository

কিংবা **'রাজা'** নাটকে-

'বিরহ মধুর হল আজি',

'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' প্রভৃতি গান।

নাট্য-বিচ্ছিন্নভাবে গানগুলির আবেদন বারবার আমাদের মুগ্ধ মনোযোগ আকৃষ্ট করে নিঃসন্দেহে; কিন্তু পঞ্চক চরিত্রের পক্ষে যতখানি স্বত:স্ফূর্ত মনে হয়

'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে,'

'ঘরেতে ভ্রমর এল'

তবু এই ধরনের সমস্যা খুব প্রবল নয় রবীন্দ্রনাথের নাটকে। এমনকি তাঁর নাটকে গানের প্রাচুর্যকে কখনো কখনো অতিরিক্ত মনে হলেও নাট্য-বিষয় থেকে দূরে নয় প্রায় কোনো গানই। ব্যতিক্রম কিছু আছে, যেমন **'তপতী'** নাটকে বিপাশার গান। তার **'মন যে বলে চিনি চিনি'**, বা 'বকুলগন্ধে বন্যা এল.' কিংবা 'দিনের পরে দিন যে গেল' গান হিসেবে যত সম্পূর্ণই হোক নাটকে এ গানের কোনো মূল্যই নেই প্রায়।

আসলে প্রচলিত প্লটগঠন চরিত্রবিদ্যাসমিতির বাইরে যে নাট্যরচনা শুরু হল **'শারদোৎসব'** সংলাপ বা কথার ভাষাই যথেষ্ট হল না, তাই সেখান থেকে আরম্ভ হল 'কথার ভাষা'র সঙ্গে 'সুরের ভাষা' মিশিয়ে 'ভাবের ভাষা'কে ধরবার আয়োজন। আমরা দেখেছি এর আগে প্রথম জীবনে গীতিনাট্যরচনার সময় অ ক্ষরিক অর্থেই কথার ভাষা আর সুরের ভাষাকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। **'বাল্মীকি-প্রতিভা'** রচনার নেপথ্যে তার চিন্তাই ছিল; **'আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন?'** হার্বার্ট স্পেন্সরের রচনায় তিনি পড়েছিলেন আমাদের অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গে সুরের কথা, সংগীতের যোগের কথা; তারও আগে 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন; **'সংগীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায়মাত্র।'** অনুভবের সঙ্গে সুরের যোগ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে দেখি; 'আমরা যখন হাসি -হা: হা: হা: হা:, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুরে লাগে।' রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার প্রায় হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে ' বাল্মীকি-প্রতিভা'র গানে–

'হা: হা: ভায়া খাপ্পা বড়ো.

'তবে আয় সবে আয়', কিংবা

'কালী কালী বলো রে আজ'

গানে হাসির প্রকাশ হয়েছে শুদ্ধসুরের কাটা কাটা প্রয়োগে। 'পথ তুলেছিস সত্যি বটে গানের হাসিতে অবশ্য কোথাও কোথাও কোমল সুর লেগেছে, কিন্তু হাসির মুল রূপটি এখানে অব্যাহত;

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ টানা বা গড়ানো সুর একটি নেই, প্রতিটি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান হাসির ভাবটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

ভাবের সঙ্গে সুরের এই যে সংগতি, নাটকের গানে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানে এটিই তাৎপর্যময় মনে হয় আমাদের কাছে। তখন 'বাল্মীকি প্রতিভার কোন গান 'বিলাতি সুরে রচিত, কোন গান 'জ্যোতিভিদাদার রচিত গতের সুরে বসানো, আর কোন গান বিশুদ্ধ 'বৈঠকিগান ভাঙা'– এই খবর তথ্যের অতিরিক্ত কিছু দেয় না আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য- **'শ্যামা, এবার ছেড়ে চলেছি না'** পৃথক হয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের রামপ্রসাদী সুরে রচিত অন্যান্য গানের থেকে। রক্ষণীয় যে গোটা নাটকাটিতে একবারই মাত্র প্রযুক্ত হয়েছে রামপ্রদাসী সুরের গান, শ্যামার কাছ থেকে বাল্মীকির বিদায় গ্রহণ মুহূর্তে। যে সুরে শ্যামার আরাধনা করা হয় সেই সুরেই বিদায়গান গাওয়ায় বাল্মীকির দ্বন্দ্ব, বেদনা, উত্তরণ-সবটুকু গাঁথা হয়ে যায় এক নিমেষে। সুর আর শুধু সুরের সীমায় বাঁধা থাকে না তখন, ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে খুঁজে পায় আপন পূর্ণতা।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবই সংগীতের রাগরাগিনীর মূল উদ্দেশ্য

সংগীতের উদ্দেশ্যেই যে ভাব প্রকাশ করা এ কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় জানিয়েছেন বার বার। **'সংগীত সুরের রাগরাগিনী নহে, সংগীত ভাবের রাগরাগিনী'**– এই বিশ্বাস তাঁর কুড়ি বছর বয়সের। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা **'রুদ্রচন্ড'** নাটকের গানে রাগরাগিনীর নির্দেশ আছে, আছে **'প্রকৃতির প্রতিশোধ'**-এর প্রথম সংস্করণে, **'নলিনী'**তে, **'রাজা ও রানী'**র প্রথম সংস্করণে, **'শারদোৎসব'**-এ এবং **'প্রায়শ্চিত্তে'**র কোনো কোনো গানে। কিন্তু এই নির্দেশ অনেক সময় আমাদের সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। **'তরুতলে ছিন্নবৃন্ত মালতীর ফুল'** গানটিকে মিশ্র গৌড়-সারং বলা হয়েছে, কিন্তু স্বরলিপিতে দুটি গানেই মিশ্র-গৌড় সারং রাগের নাম আছে। অন্যদিকে, **'প্রকৃতির প্রতিশোধ'** নাটকের প্রথম সংস্করণে ঝিঁঝিট-স্বাষ্তজের গান **'হ্যাদে গো নন্দরানী'** স্বরবিতানে মিশ্র ভৈরবী গান বলে পরিচিত। এই নাটকেই এবং স্বরবিতানেও **'বুঝি বেলা বহে যায়'** গানটি সম্পর্কে নির্দেশ আছে মূলতান রাগের, কিন্তু এই গানের সুরের বিন্যাসে মূলতান রাগের পূর্ণরূপটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না আমাদের কাছে। **'প্রায়শ্চিত্ত'** নাটকে ভূপালি রাগে নির্দেশিত **'বধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ'** গানটি স্বরবিতানে এমন রাগের নির্দেশ আছে।

নিশ্চয়ই গানগুলির সুর পরিবর্তিত হয়েছে কোনো সময়। এর উত্তর জানা নেই আমাদের। কিন্তু এটুকু সত্য যে রাগরাগিনীর নামের চেয়ে আমাদের কাছে অনেক সত্য হয়ে ওঠে গানের ভিতরকার অনুভব, যেমনটি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে ইন্দিরাদেবীকে; গানের কাগজে রাগরাগিনীর নাম না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন রাগিনী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম।

বস্তুত এইসব নাটকের মধ্যে একমাত্র **'শারদোৎসব'**-এই গানের রাগরাগিনীর সঙ্গে নাটকের যোগ খুঁজে পাওয়া যায়, আর সে যোগও কবির দৃষ্টি দিয়েই ব্যাখ্যা করা চলে। আমাদের দেশে ঋতুবৈচিত্রের সঙ্গে রাগরাগীনির সম্বন্ধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন;

'ঋতুর রাগরাগনী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুর জন্যই কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব, কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার, আর বর্ষার মেঘ, মল্লার, দেশ এবং আরও বিস্তার।'

Dhaka University Institutional Repository

শরৎ-হেমন্তের প্রকাশ যে রাগরাগিনীতে নেই এর কারণ সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, এই ঋতুর উৎসবে 'বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠ-খাট জুড়িয়া বসে।' আর 'বাস্তবের সভায় সংগীত নুজরা দিতে আসে না, যেখানে অখন্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।' কিন্তু আমাদের মনে হয় শরতের শাস্ত্রসম্মত রাগরাগিনী থাক বা না-ই থাক, রবীন্দ্রনাথ শরৎ ঋতুকে পেয়েছেন প্রভাতের সুরে। তাঁর চোখে, শরৎ 'একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া দরদী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে। তার কাঁচা দেহখানি, সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি গায়ের গন্ধের মতো, আকাশে আলোকে গাছ-পালায় যা-কিছু রঙ দেখিতেছি, সে তো একেবারে তাজা।' এই রঙ তিনি দেখেছেন ধানক্ষেতের সবুজে, আকাশের নীলে, প্রভাতের কাঁচা সোনা রঙের রোদে। শারদোৎসবের পুরোহিত সন্ন্যাসীর কাছে শুনি, শরতের উৎসব সেই আলো সেই আকাশের সঙ্গে মিলনের উৎসব;

'বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো, নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব না, আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।'

এ নাটক একান্তভাবে প্রভাতেরই পটভূমিতে রচিত, আর সেই কারণেই গানগুলি বাঁধা হয়েছে নিম্নের প্রভৃতি প্রভাতী সুরে-

ভৈরবী	-----------	আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি
সিন্ধুবৈরবী	-----------	আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান
বিভাস	------------	মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
ললিত	------------	তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
রামকেলি	-----------	নবকুন্দধবল সুশীতলা
মিশ্র রামকেলি	-----------	আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ
আশহিয়া	------------	আমার নয়নভুলানো এল

(নাটকে লেখা আছে আলেয়া)

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রকৃতি ভাবনার ছোঁয়ায় গান যেমন পরিবেশ রচনা করছে **'শারদোৎসব'** বা **'ঋণশোধ'** নাটকে, গানের ভিতর দিয়ে ঠিক সেইরকম পরিবেশ রচিত হয়েছে **'ফাল্গুনী'** নাটকে, একটু ভিন্নভাবে। বসন্ত-ঋতুর অনুষঙ্গে যে রাগ রাগিনীর উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তার কিছু স্পর্শ আছে **'রাজা'** নাটকে;

'আজি দখিন দুয়ার খোলা',

Dhaka University Institutional Repository

'আজি কমলমুকুলদর খুলিল',

'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' প্রভৃতি গানে,

কিন্তু **'ফাল্গুনী'**র গানে বড়ো হয়ে উঠেছে বসন্তের রূপ, যে রূপে কবি দেখেছেন 'প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব'। বসন্ত তাঁর কাছে আনন্দের উল্লাসের ঋতু, সে 'নাড়া দেয় আমাদের বাহির মহলের যৌবনকে'।

'ফাল্গুনী'তে রেণুবনের গানে---- 'ওগো দখিন হাওয়া'

পাখির নীড়ের গানে---------- 'আকাশ আমার ভরল আলোয়'

নবযৌবনের গানে---------- 'আমরা নূতন প্রাণের চর'

বসন্তের হাসির গানে----------'ওদের ভাব দেখে যে পায় হাসি' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সেই আনন্দ, সেই চঞ্চলতার সুর। যুবকদলের উচ্ছলতার গান (**'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'**) কিংবা চন্দ্রহাসের বসন্তের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তোলার কথাটি রূপ পেয়েছে অন্ধ বাউলের যে গানে– **'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা'**, তার সুরও সেই একই অনুভবের প্রকাশ।

Dhaka University Institutional Repository

রাগরাগিণীর সাথে বাউলসুরের মিলন

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সুর আর বাণীর কথা, কিন্তু আমরা দেখতে পাই বাউল চরিত্রটিও বার বার তাঁর নাটকে এসেছে বিচিত্ররূপে। **'ফাল্গুনী'**তে দেখি অন্ধবাউলকে, বাউল আছে **'অরূপরতন'** আর **'মুক্তধারা'**তেও **'রাজা'** নাটকে আছে বাউলের দল। আর ঠিক বাউল নয়, অথচ বাউলের মতোই গীতস্বভাব চরিত্র-

বসন্ত রায়------ **'প্রায়শ্চিত্ত'**

ধনঞ্জয় বৈরাগী-- **'প্রায়শ্চিত্ত' 'মুক্তধারা' 'পরিত্রাণ'**

ঠাকুরর্দা----- **'শারদোৎসব' 'রাজা' 'অরূপরতন'**.

শেখর-------**'ঋণশোধ'**। নাটকভেদে চরিত্রগুলির নাটকীয় ভূমিকা বিভিন্ন হলেও এদের প্রধান সাদৃশ্য স্বভাবের গীতিমুখরতায়। এদের সংলাপ অনেক সময়ই গান, আর দেশী লোকসংগীতের সুরে যত গান আছে রবীন্দ্রনাথের নাটকে, অধিকাংশ গানের গায়ক এই বাউল বা বাউল ধরনের চরিত্ররাই।

'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খেপা সে,'

'রইল বলে রাখলে কারে',

'ওরে আগুন আমার ভাই' (ধনঞ্জয়),

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে',

'যা ছিল কালো ধলো' (বাউলের দল),

'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' (শেখর) তার কয়েকটি নির্দশন। সংখ্যার দিক থেকে **'পরিত্রাণ'** নাটকে এই ধরনের গান সবচেয়ে বেশি।

অবশ্য এই সব চরিত্রের কণ্ঠে অন্যান্য সুরের গানও আছে, যে গানকে হয়তো রাগরাগিনীর নামেই চিহ্নিত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তা হলেও বসন্ত রায়ের, 'ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না'

ধনঞ্জয়ের, 'আরো আরো প্রভু আরো আরো',

'আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন', বা

ঠাকুর্দার 'আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান',

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে',

'আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়', কিংবা

অন্ধ বাউলের 'হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে' গানে রাগরাগিনীর বন্ধন পেরিয়ে গভীর কথা সহজ সুরে বলার ভঙ্গিটিই মুগ্ধ করে আমাদের।

'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউল বলে, গান না গাইলে সে রাস্তা পায় না। এই উক্তি কেবল তার একার পক্ষে সত্য নয়, জীবনে চলার পথে গান এদের সকলেরই নিত্যসঙ্গী, সংলাপের মতোই গান স্বভাবগায়ক এই চরিত্রগুলির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

তাই ঠাকুর্দার 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' বা

'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশার',

ধনঞ্জয়ের 'কে বলেছে তোমায় বধু এত দুঃখ সইতে',

অন্ধ বাউলের 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে' কিংবা

'তোমায় নতুন করে পাব বলে, হারাই ক্ষণে ক্ষণ' গানের অপেক্ষাকৃত জটিল সুরও আশ্চর্য সামঞ্জস্য পেয়ে যায় চরিত্রের সঙ্গে।

অবশ্য লক্ষ্য যায় যে এদের অধিকাংশ গান নাট্যবিষয়ের ভিতরের কথাটিকে যতটা ব্যক্ত করতে চায়, আত্ম চরিত্রকে ততটা উন্মোচন করে না। আর সে কথাটিও গানে যত বলে সংলাপে বলে তার চেয়ে বেশি।

'ফাল্গুনী'র বাউল বাইরের দৃষ্টি হারিয়ে ভিতর দিয়ে দেখতে শেখে, আর ধনঞ্জয় ঠাকুর্দা এমন কি শেখরও বাইরের দৃষ্টি না হারিয়েই পেয়েছে জীবনকে দেখার নিরাসক্ত প্রেমময় অন্ত দৃষ্টি। তাই অনেক সময়ই এরা নাটকের তত্ত্ব বা জীবনের সত্যের কথা বলে সংলাপে, আর গানে করে সেই ভাবেরই পুনরুচ্চারণ, কখনো বা বিস্তার। তা হলে কি আমরা বলতে পারি এদের গানে

Dhaka University Institutional Repository

সংলাপের অতিরিক্ত কিছুই পাওয়া যায় না সুর ছাড়া, অনেকটা তাই (অবশ্য)।তারই মধ্যে কখনো কখনো আশ্চর্যভাবে রচিত হয়ে যায় নাট্যমুহূর্ত। বলা যেতে পারে **'মুক্তধারা'** নাটকে বাউলের 'ও তো ফিরবে না রে' গানটির কথা। আসন্ন অশুভের যে আশঙ্কা জেগে ওঠে দর্শকের মনে বাউলের এই গান যেন তারই ইঙ্গিত। শঙ্খ ঘোষ যথার্থই বলেছেন, কেবল বাউলই নয়, দর্শকের মনও বলে **'ও তো ফিরবে না রে ফিরবে না আর ফিরবে না রে।'** কথায় বা সংলাপে যা হতে পারত অতিপ্রকাশ্য, বাউলের সুর সেই উৎকণ্ঠাবেদনাকে পরম সূক্ষ্মতায় ছড়িয়ে দেয় আমাদের মনে।

কিন্তু এরকম উদারহণ খুব বেশি দেওয়া যায় না। আগেই বলেছি এদের সংলাপ ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার প্রকাশ নয়, জীবন সম্পর্কে অখন্ড বোধেই এদের বিশ্বাস। কথায় বোধ নাট্যদেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে, কিন্তু সুরের মায়ায় তা অনেক সময়ই সরে যায় ঘটনার আবেষ্টন থেকে দূরে। **'শারদোৎসব' 'ঋণশোধ' 'ফাল্গুনী'**র নাট্য গঠনের সঙ্গে এই ধরনের গানকে মিলিয়ে নেওয়া কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু **'প্রায়শ্চিত্ত'-'মুক্তধারা'** কিংবা **'রাজা'- 'অরুপরতন'** নাটকের বিন্যাস ভিন্ন রকমের। তাই ধনঞ্জয় বা ঠাকুর্দার গান আমাদের গীতরসে আপ্লুত করলেও নাটকের পক্ষে ভারও মনে হয় কোনো কোনো গানকে।

প্রায় এই ধরনেরই গীতস্বভাব চরিত্র সুরঙ্গমার গান সম্পর্কে অবশ্য ঠিক এমনটি মনে হয় না। তার গান কখনো তার নিজস্ব অনুভব বা চরিত্রের ব্যাখ্যা, কখনো রাজার সত্যরূপের উদঘাটন; কিন্তু সবচেয়ে বেশি বোধহয় রানী সুদর্শনার অন্তরের ক্রম-উত্তরণের প্রকাশ, যে উত্তরণ নাটকের, মূল বিষয়। এ কথা **'রাজা'** নাটকের চেয়েও সত্য **'অরুপরতন'**এ। সুর্দশনা তাকে বলে: 'তুমি আমার হয়ে ডাকো-না', সুরঙ্গমা তার হয়েই ডাকে:

'খোলো খোলো দ্বার

রাখিয়ো না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে', সুদর্শনার জন্যই তার উৎকণ্ঠা;

'বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি?'

'এখনো গেল না আঁধার

এখনো রহিল বাঁধা': এ তো সুদর্শনারই বেদনাময় আর্তি;

Dhaka University Institutional Repository

আর সব দু:খের শেষে সুদর্শনার উক্তি **'কে বললে তিনি নেই- সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন'**

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সুরঙ্গমা যখন গায়:

'আমার আর হবে না দেরি

আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরি', সুদর্শনারই উপলব্দি।

নাটকের সমাপ্তিতে আছে ভোর হওয়ার ইঙ্গিত। সুরঙ্গমা গান ধরে:

'ভোর হল বিভাবরী

পথ হল অবসান।'

এ গানে লেগেছে ভৈরব-অঙ্গের সুর, রাগশাস্ত্র-মতে ভোরবেলার সুর। রবীন্দ্রনাথের অনুভবেও ভৈরো যেন ভোরবেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ। দুঃখের রাত্রির অবসানে সুদর্শনার চিত্রের জাগরণের সুরটিও বাঁধা হয়ে যায় সুরঙ্গমার গানের সঙ্গে।

সুরঙ্গমার গান কেবল গান-শোনানোর আয়োজন নয়, সংলাপের পুনরুক্তিমাত্রও নয় ,নাটকের প্রয়োজনেই কথার ভাষার সঙ্গে নাট্যকার তাকে দিয়েছেন সুরের ভাষা; সুদর্শনার সংলাপের পাশে তার গান নিয়ে আসে এক পূর্ণতার বোধ। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুরঙ্গমার যে সমর্পিত ভাবটি আমাদের আবিষ্ট করে রাখে, তার গানেও আছে সেই ভাবই; তাই তার সমস্ত গানকে এক সুরের সমগ্রতায় বেঁধে নিতে ইচ্ছে করে আমাদের, সে সুরের নাম 'নিদেন', যে সুর আছে **'নটীর পূজা'**র শ্রীমতীর আত্ম-উদ্‌বোধনের গানেও।

আর এই ভাবনার সূত্র ধরেই পঞ্চম কিংবা ধনঞ্জয় বৈরাগী-ঠাকুর্দা-অন্ধ বাউল প্রভৃতির গানের সুরকেও বলতে পারি সহজ আনন্দের সুর, মুক্তির সুর।

Dhaka University Institutional Repository

সংগীত তার গীতত্বের মূল্যেই নাটকে বিশিষ্ট

সংলাপ নয়, চরিত্র ব্যাখ্যা নয়, এমনকি গায়কচরিত্রের ব্যক্তিগত অনুভব কিংবা নাট্যতত্ত্বের প্রকাশও নয়, গান তার গীতত্বের মূল্যেই নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকা হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের এমন নাটক সম্ভবত একটিই আছে, **'গৃহপ্রবেশ'**---

'বাজো রে বাঁশরি বাজো',
'ওই মরণের সাগরপারে',
'যদি হল যাবার ক্ষণ',
'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে' ইত্যাদি।

এ স্পষ্টতই গীত যোজনার আয়োজন, তা হলেও হিমির গান নিরর্থক হয় না বিপাশার গানের মতো। মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের সৌন্দর্য্যধ্যান আর বাস্তব ব্যর্থতার মতোই এখানে লেগেছে সাংগীতিক মাধুর্য্যের স্পর্শ, সুর এ নাটকে সঞ্চার করেছে প্রাণের রস, যার অভাবে বিবর্ণ পাণ্ডুর শুধুই কষ্টের ছবি হয়ে উঠতে পারত এ নাটক। আমরা বুঝতে পারি গানগুলির প্রয়োগ হবে হিমির চাপা বেদনার অভিব্যক্তিতে, নিছক গান গাওয়াই তার কাজ নয়।

কিন্তু হিমির গানে প্রার্থিত বেদনার সুর, কেমন করে বেজে উঠবে, বিশেষত **'বাজো রে বাঁশরি বাজো'**র মতো গানে, যে গান **'শাপমোচন'** এ বিবাহের আসরে বঁধুর প্রতি সখীদের আহ্বান কেবল গানের লয় পৃথক পরিবেশ রচনা করা দেয়। ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে যে লয়েরও পরিবর্তন হওয়া উচিত, এই প্রয়োজনীয় কথাটি আমাদের জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুত্য: লয়ের তারমধ্যে সুরের ধরন বদলে যায়, গানের অর্থও ভিন্ন হয়ে যায় অনেক সময়। সেই কারণেই যে গান দ্রুত লয়ে **'শাপমোচন'**-এ হতে পারে আনন্দের বিস্তার, সেই গানই **'গৃহ-প্রবেশ'** এ পরিবেশের বেদনাকে ধরে রাখতে পারে অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়ে।

সুর প্রাণময় হয়ে ওঠে লয়েরই স্পর্শে; আর নাটকে গানের লয় উঠে আসে শুধু কথা সুরের খেলা থেকেই নয়, গায়কচরিত্র কিংবা পরিবেশ থেকেও।

'মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ',
'আমাদের পাকবে না চুল',
'আমাদের খেপিয়ে বেড়ার',

Dhaka University Institutional Repository

'চলি গো চলি গো',

'ভালোমানুষ নই রে মোরা' প্রভৃতি গানের গতির চঞ্চলতার ভাব, যা **'ফাল্গুনী'**র যুবকদলের স্বভারেরও ছন্দ, ঢিমা লয়ে তার যোগ্য স্ফূর্তি প্রকাশ হতে পারে না ।

আসলে কথা ও সুর কোনটিকেই তাল-খন্ড খন্ড করে ে নয়, আমরা এগুলির অভিন্ন সমগ্রতায় গানের ভাবকে শেষ পর্যন্ত ধরে নিতে চাই । তাই গানে কথা আর সুরকে অভিন্ন ভাবে দেখা অসম্ভব।

কথা ও সুরের যুগলমিলন নাটকের গানে

আমরা জানি গানে কথা ও সুরের মধ্যে কে কার অনুগত্য স্বীকার করবে, এই তর্কে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ; কখনো কথার দিকে তাঁর ঝোঁক, কখনো তাঁর পক্ষপাত সুরের প্রতি। কুড়ি বছর বয়স থেকে জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই দ্বিধা দেখা যায় তাঁর সংগীত সম্পর্কিত ভাবনায়। এক বয়সে তাঁর মনে হয়েছিল শুধু কথা অনুভবের যে প্রাপ্ত স্পর্শও করতে পারে না, সুর সেখানে পৌছে যায় অনায়াসে। এই চিন্তার ছাব্বিশ বছর পরে এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টই জানালেন; **'মত বদলিয়েছি। কতবার বদলিয়েছি তার ঠিক নেই।... শেষ দিন পর্যন্ত যদি মত বদলাবার শক্তি অকুণ্ঠিত থাকে তা হলে বুঝব এখনো বাঁচবার আশা আছে।'** এই সময় সংগীতে **'যুগলমিলনে'**র প্রতিই তাঁর আগ্রহ, যে আগ্রহ এর একবছর আগেই দেখা গেছে **'কথা ও সুর'** প্রবন্ধে;

'আমরা যে গানের আদর্শ মনে রেখেছি তাতে কথা ও সুরের সাহচর্যই শ্রদ্ধেয়, কোনো পক্ষেরই আনুগত্য বৈধ নয়। সেখানে সুর যেমন বাক্যকে মনে তেমনি বাক্যও সুরকে অতিক্রম করে না। কেননা, অতিক্রমণের দ্বারা সমগ্রসৃষ্টির সামঞ্জস্য নষ্ট করা কলারীতিবিরুদ্ধ।'

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধারাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে নাটকে গানের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর সচেতন পরিকল্পনা ছিল, এবং সে পরিকল্পনা নাট্যগঠনের সঙ্গেই যুক্ত। কথায় যে ভাব প্রকাশ করা যায় না, যে পরিবেশ নিছক সংলাপে গড়ে ওঠে না, তারই জন্য নাটকে একেছে গান।

বিশু গায়:

'তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো... ওগো দুখজাগানিয়া।'

নন্দিনী তাকে প্রশ্ন করে:

'তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া'?

এই প্রসঙ্গেই আসে বিশুর ব্যক্তিগত দু:খের কথার পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে যে গান, সে দুখের কথা বলেও অনুভবকে নিয়ে যায় দু:খের সীমার বাইরে, ব্যথার অতীত অনির্বচনীয় লোকে। শুধু কথায় যা হতে পারত অতিপ্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বেদনায় যা পড়ত বাঁধা, সুর তাকে উত্তীর্ণ করে দেয় নিভৃত নিবিড় প্রেমের অনুভবে। অথচ গানের মধ্যে তো গানের আনন্দই নয় কেবল, দু:খের উপলব্ধিটিও থাকে জড়িয়ে? এই যে একই সঙ্গে দু:খবোধ এবং উত্তরণ, এ উঠে আসে বিশুর স্বভাব থেকেই, আর সুর তাকে দেয় যোগ্য ভাষা।

এ হল কথার ভাষা আর সুরের ভাষাকে তাদের স্বতন্ত্র রূপে যুক্ত করার আয়োজন। আবার কোথাও কথার ভাষা আর সুরের ভাষা মিলে গেছে অভিন্ন চেহারায়, এর সূচনা **'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'চিরকুমার সভা'** আর **'তাসের দেশ'** এ আছে এমন কিছু উদাহরণ। **'চিরকুমার সভা'**র অক্ষয় সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে সুরে গেয়ে উঠেছে দু'চারটি কলি, সে সুরে কৌতুকময় কথা বলার ধরনটিই প্রধান; প্রচলিত অর্থে এদের 'গান' বলা যাবে কি না সংশয় হয়, সংলাপের সঙ্গে যোগেই এগুলির সার্থকতা।

একটি উদাহরণ;

'দেখো, ধর্মে-কর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না; স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব– তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যতদূর কানে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে'

Dhaka University Institutional Repository

গান

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে

পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে

ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে

বিষ্ণুদূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে।'

কোনো কোনো গানে রাগরাগিনীর স্পর্শও আছে, যেমন **'পাছে চেয়ে বসে আমার মন'** গানে আছে রাগিনীর লক্ষণ, কিন্তু রাগরূপকে অতিক্রম করে লঘু চাপল্যের প্রকাশই এখানে উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে, যা অক্ষরের স্বভাবসূত্রেই আগত। যে উক্তি এই গানকে সঙ্গে করে নিয়ে এল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে: 'গরিবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ করে বাজুবন্ধ চেয়ে বসে':

গান

'পাছে চেয়ে বসে আমার মন

আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।

পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা

আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।'

'চিরকুমার সভা'র কৌতুকমুখর পরিবেশের সঙ্গে এই গানগুলি মিলে যায় অনায়াসে, যেমন মিলে যায় **'তাসের দেশ'**এর চরিত্রের সঙ্গে কাটা কাটা সুরের বিন্যাসে রচিত

'তোলন নামন পিছন সামন' কিংবা

'চিঁড়েতন হরতন ইস্কাতন' গান। **'হাই'**, **'হাচি'**, আর **'ইচ্ছে'**র গানেও আছে এইরকম কথা বলার ভঙ্গি। **'চিরকুমার সভা'** আর **'তাসের দেশ'**-এর এই গানগুলি আমাদের স্মরণ করায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের নাট্যভাবনা; **' সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন?'**

Dhaka University Institutional Repository

এরই পূর্ণতর রূপ দেখি **'চণ্ডালিকা'** নৃত্যনাট্যে, গানই যেখানে সংলাপ। আমাদের মুখের ভাষা সে গানের বাণী, আর সুরবিন্যাসের ধরণে সেগুলি যত গান তার চেয়ে বেশি সুরে কথা বলা। প্রকৃতির গানে আনন্দের জল চাওয়ার সেই আশ্চর্য বর্ণনা, গদ্যনাটক 'চণ্ডালিকা'র সংলাপের সঙ্গে এর দূরত্ব আর এই বর্ণনা যে প্রকৃতিরই নয় কেবল, আমাদের মনেও নিয়ে আসে শিহরণের স্পর্শ, সে তো সুরের যোগ্য-উচ্চারণেই? অবশ্য সুর এখন আর প্রথম যুগের গীতিনাট্যের মতো কথার বা ভাবের বাহনমাত্রই নয়, কথা আর সুর এই অন্ত্যপর্বে পেয়েছে অনায়াস সংগতি। সেইসঙ্গে নাটক আর গানও মিলে গেছে নিবিড় একাত্ততায়। বোধহয় এটিই ছিল রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত। কথার আবেষ্টন থেকে সুরের মধ্যে ভাবকে বিস্তার দেওয়া, কিংবা সুরের সহায়তায় কথার গভীরে প্রবেশ করার যে টুকরো টুকরো উদাহরণ ছড়ানো আছে রবীন্দ্রনাটকে, তাঁর শেষ জীবনের নৃত্যনাট্যগুলি তারই সংহত সার্থকতম প্রকাশ। এ সেই সময় যার স্বল্পকাল পরেই তিনি লিখেছেন;

'বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে।'

গান তাঁর অন্যতম আশ্রয়। আর গানের ভিতর দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে তাঁর নাট্যমুক্তির আকাঙ্খা। নাটকের ভাষা একটিই, কথা-সুরে সমগ্র সেই অখন্ড রূপের নাম গান। গান আর নাটককে মিলিয়ে দেবার সাধনা এতদিনে পেল প্রত্যাশিত নাট্যস্পূর্ণতা। **'গানের সুরে আমার মুক্তি'** শুধু গীতরচয়িতা রবীন্দ্রনাথের কথাই নয়, এ যেন নাট্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথেরও অন্তরতম অনুভব।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাটকে গানের ব্যবহার

রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টির শ্রেণী বহুতর তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যেমন গীতিনাট্য, গাথানাট্য, কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক, সাংকেতিক বা তত্ত্বনাট্য, প্রহসনাত্মক নাট্য, সামাজিক নাট্যরূপে ইত্যাদি আমাদের কাছে বিশেষ পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই সকল শ্রেণীর নাটকেই সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন- দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। এই পর্যায়ে রবীন্দ্রনাটকে গান ব্যবহারের উদাহরণ সহ কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হল-

ভগ্নহৃদয়

ভগ্নহৃদয় থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যগীত রচনার শুরু। ভগ্নহৃদয়ে অনেক পাত্র-পাত্রী আছে, কবিতায় সংলাপ আছে এবং চরিত্রগুলির সংলাপে একটি কাহিনীও গড়ে উঠেছে। মূল কাহিনীর নায়ক কবি ও নায়িকা মূরলা। এদের দুজনারই গান আছে, অপর চরিত্রগুলোরও গান আছে। চতুর্থ স্বর্গে কবিই গেয়েছেন আটটি গান। ভগ্নহৃদয় ষষ্ঠ স্বর্গে **'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়'** গানটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকৃত নিজের গান রূপে আখ্যায়িত করেছেন। এটি কবির বিলেতযাত্রার পূর্বে আমেদাবাদ বাসকালে রচিত ও পরিবর্তিত আকারে ভগ্নহৃদয়-এ অন্তর্ভূক্ত হয়।

চপলা'র গান ---------- 'সখী ভাবনা কাহারে বলে',

অনিলের গান ---------- 'কাছে তার যাই যদি',

নীলিমার গান ---------- 'কী হল আমার বুঝিবা সজনী'

প্রভৃতি কবির প্রথম দিককার জীবনে রচিত উল্লেখযোগ্য গান। ভগ্নহৃদয়-এর গান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট দূর্বলতা ছিলো। ভগ্নহৃদয়-এর প্রায় সব গানই প্রেমসঙ্গীত। ১৮৮১ সালের জুন মাসেই 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশের দুইদিন পরে প্রকাশিত হয় **'রুদ্রচন্ড'**। ভগ্নহৃদয়-এ গানের প্রাধান্য, রুদ্রচন্ড-এ কাহিনীর প্রাধান্য। রচনা হিসেবে রুদ্রচন্ডও দুর্বল।

Dhaka University Institutional Repository

নলিনী

১৮৮৪ সালে নলিনী প্রকাশিত হয়। এটি গদ্যে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত নাটক। এতে কয়েকটি গান রয়েছে।

'হা কে বলে দেবে মোরে',

'ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে',

'ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে',

'মনে রয়ে গেল মনের কথা' প্রভৃতি গান এর অন্তর্গত।

বাল্মীকিপ্রতিভা

রবীন্দ্রনাট্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে বাল্মীকিপ্রতিভা। পরবর্তী সঙ্গীত নাট্যসমূহের প্রবণতাগুলোকে এখানে অনুভব করা যায়। বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৮৮১ সালে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্য প্রকাশ করেন। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয় **'কালমৃগয়া'**। বাল্মীকিপ্রতিভার তিনটি রূপ পাওয়া যায়। তিনটি রূপ হচ্ছে এই গীতিনাট্যের তিনটি সংস্করণ। ১৮৮৬ সালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে যখন বাল্মীকিপ্রতিভার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন কালমৃগয়ার কিছু অংশও এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়। কালমৃগয়া থেকে দশটি গান কোনোটি বিশুদ্ধ আকারে, কোনোটি কিছু পরিবর্তন করে বাল্মীকিপ্রতিভায় গৃহীত হয়েছে। কালমৃগয়ার শিকারীদের প্রতি দশরথের আদেশ **'গহনে গহনে যা রে তোরা'** গানটিকে বাল্মীকিপ্রতিভায় দস্যুসর্দার রত্নাকরের মুখে বসানো হয়ে। কালমৃগয়ার রাজবিদূষক বাল্মীকিপ্রতিভায় প্রথম দস্যুতে রূপান্তরিত হয়েছে। বনদেবীর অংশগুলিও কালমৃগয়া থেকে এসেছে। তাদের মুখেও একটি নতুন গান যোজনা করা হলঃ **'মরি ও কাহার বাছা'**। আইরিশ সুরে গানটি বসানো হলো। এছাড়া এই উপলক্ষ্যে কুড়িটি নতুন গান রচিত হলো। বাল্মীকিপ্রতিভার তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন **'বাল্মীকিপ্রতিভায় একটি নাট্যকথাকে গানের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয়েছিলো, মায়ারখেলায় গানগুলিকে গাঁথা হয়েছিল নাট্যসূত্রে। একটা সময় এসেছিল যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল।'**

Dhaka University Institutional Repository

বাল্মীকিপ্রতিভা কয়েকটি গান পাশ্চাত্যসঙ্গীতের সুরে গ্রথিত হয়। এই বাল্মীকিপ্রতিভা নাটকের পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরনির্ভর গানের তালিকা হচ্ছে-

আয় সবে আয়---------- অজ্ঞাত;

কালী কালী বলো রে আজ-------- Nancy Lee;

মরি ও কাহার বাছা---------- Go where glory waits the।

কালমৃগয়া

কালমৃগয়াতেই আমরা পরবর্তী রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুটি মূখ্য প্রবণতার পূর্বাভাস পাই, একটি ঋতুগীতি আর একটি ব্রহ্মগীতি রচনার আগ্রহ। কালমৃগয়া গীতিনাট্যে বর্ষার যে বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে তা কেবল নাট্যপ্রয়োজনেই নয়। নাটককে অতিক্রম করে তরুণ কবিমনের ঋতুচেতনা বর্ষার জলধারার মতো সুরে ছন্দে মন্ডিত হতে চেয়েছে। নিশিত রজনীতে অন্ধমুনির পুত্রকে নদীতীরে তৃষ্ণাবারি সংগ্রহে পাঠাবার কালে বর্ষাধারার অনিবার্য প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু এই অবকাশে বনদেবতা ও দেবীগণের গীতমত্ত উল্লাসে কবি যেন তাঁর জীবনের প্রথম বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করেছেন। মল্লার ও মেঘমল্লারের সুরে এই বর্ষাগীতিগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কবির পরবর্তী বর্ষগীতগুলির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। কালমৃগয়ার চতুর্থ দৃশ্যে তিনটি বর্ষাগীত আছে বনদেবীদের কণ্ঠে। এই তিনটি গানে কবির বর্ষাসঙ্গীতের দুটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। প্রথম বর্ষামুখর অন্ধকারত্রস্ত রজনীর বর্ণনা এবং দ্বিতীয়ত, বর্ষার সঙ্গে মানবমনের উল্লাসানুভূতি। **'সঘন ঘন ছাইল'** গানের পাশে পরবর্তীকালের **'ঝরঝর বরিষে বারিধারা'** রাখলেই এই সত্য বেঝা যাবে। **'আয়রে সজনি সবে মিলে'** গানটি যেন **'এসো শ্যামল সুন্দর'** কিংবা **'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে'** গানের পূর্বাভাস।' কালমৃগয়া কয়েকটি গান পাশ্চত্য সঙ্গীতের সুরে গ্রথিত হয়।এখানে কালমৃগয়ায় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরনির্ভর গানের উদাহরন দেওয়া হল-

দেখবি রে ভাই, আয় রে ছুটে-----The vicar of Bray;

তুই আয় রে কাছে আয়--------- The British Grenadiers;

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে---------- Ye banks and braes of Bonnic Doon (স্কচ গান);

মানা না মানিলি---------- Go Where glory waits thee;

সকলি ফুরালো:---------- Robin Adair (স্কচ)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির প্রতিশোধ

নাটক প্রকৃতির প্রতিশোধ যখন রচনা করেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২৩। কারোয়ার থেকে ফিরবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর কয়েকটি গান লিখেছিলেন কবি। অদ্ভুত আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি তিনি জাহাজের ডেকে বসে সুর দিয়ে গাইতে গাইতে রচনা করেছিলেন-

হ্যাদে গো নন্দরানী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও
আমার রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

'তখন আমার বয়স তেইশ কিম্বা চব্বিশ হবে, কারোয়ার থেকে জাহাজে আসতে আসতে হঠাৎ যে গান সমুদ্রের উপর প্রভাত সূর্যালোকে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল তাকে নাট্যীয় বলা যেতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মগত নয় সে কল্পনায় রূপায়িত । হ্যাদে গো নন্দরানী গানটি একটি ছবি, যার রস নাট্যরস। এই গানটি প্রকৃতির প্রতিশোধে ভুক্ত করেছি। এই আমার হাতের প্রথম নাটক, যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।'

প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্রভাবে নাটকে গান ব্যবহারে প্রয়াস পেলেন। এ নাটকে কিছু গান আছে যা নাটকের পরিস্থিতির অন্তর্গত। ভিক্ষুকদের গান, স্ত্রীলোকদের গান, পুরুষের গান প্রভৃতি এমনি রচনা, যা নাটকেরই অঙ্গ, এর বাইরে এসব গানের কোন মূল্য নেই। কিন্তু কিছু গানে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের আকাঙ্খা এসে মিশ্রিত হয়েছে, যার জন্য এসব গান নাট্যকর্মের সীমা অতিক্রম করে সাধারণ সঙ্গীতে পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকে ব্যাপকভাবে পদাবলী কীর্তনের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।

মায়ার খেলা

এরপরই আসে বিখ্যাত রবীন্দ্রগীতিনাট্য 'মায়ার খেলা'র কথা। সখীসমিতির জন্য এই গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছিলো (১২৯৫)। মায়ার খেলা গীতিধর্মী রচনা। ৬৩টি কাব্যগীতির সমন্বয়ে এই নাটক রচিত। এর মধ্যে অনেকগুলো গান সুরে ও বাণীতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্তর্গত। এতগুলো দীর্ঘ গানের সন্নিবেশের ফলে মায়ায় খেলার নাট্যক্রিয়া অত্যন্ত শিথিল হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গেছে। তবে তার স্থলে পাওয়া গেছে আবেগ-গভীরতা। এই নাটকে অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি প্রেমের গান, ঋতুসঙ্গীত পূর্বে পৃথক গান হিসেবে রচিত হয়েছিল। কিন্তু অতি অনায়াসেই সেসব গান এখানে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। মানসী যে বাইরের ভুবনে নেই, সে থাকে অন্তরে, অন্তরের তার যথার্থ অবস্থান সে কথা অমর জানতনা, জানিয়ে দিলেন মায়াকুমারীগণ দ্বিতীয় দৃশ্যেঃ

মনের মতো কারে খুঁজে মর
সে কি আছে ভুবনে
সে যে রয়েছে মনে
ওগো, মনের মতো সেই তো হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

দ্বিতীয় দৃশ্যে মায়াকুমারীগণ প্রস্থান করলে নেপথ্যপানে চেয়ে শান্তা গাইলঃ

আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই তুমি তাই গো
তোমা ছাড়া আর এ জগতে
মোর কেহ নাই কিছু নাই গো
তুমি সুখ যদি নাহি পাও
যাও সুখের সন্ধানে যাও
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।
যদি আর কারে ভালোবাস
যদি আর ফিরে নাহি আস
তবে তুমি যাহা চাও তাও যেন পাও।
আমি যত দুঃখ পাই গো।

এর ভেতর দিয়ে যেন বাংলার টপ্পার সেই বহুশ্রুত কথাটিকেই নতুন করে শোনা গেলঃ বিরহেই প্রেমের গভীরতম উপলব্ধি, বা বিরহই প্রেমের অনিবার্য পরিণতি। মায়ার খেলার প্রেমসঙ্গীত

Dhaka University Institutional Repository

সমূহের প্রায় সবই বিষন্ন গান, সব গানেই মনোবেদনার অশ্রুবাষ্পাকুল প্রকাশ। তবে এই গান চিরন্তন মানবমানবীর শাশ্বত বিরহের সঙ্গীত নয়, এই নবযৌবনস্পৃষ্ট নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ, এদের হৃদয়ের স্পন্দনও যেন এসব গানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। মায়ার খেলায় এসব গানেরই এক অসামান্য সমারোহ, যেমন-

আমার পরান যাহা চায়,

সখী বহে গেল বেলা,

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান,

ভালোবেসে যদি সুখ নাহি,

সুখে আছি সুখে আছি সখা আপন মনে,

দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি,

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল,

অলি বার বার ফিরে যায়,

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে,

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে,

আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোটে

প্রভৃতি অসামান্য সব প্রেম ও প্রকৃতির গান এই গীতিনাট্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মায়ার খেলা পর্যায় থেকেই রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী প্রেম ও প্রকৃতিসঙ্গীত রচনার সূত্রপাত।

রাজা ও রানী

১৯২৬ সালের শ্রাবণে রাজা ও রানী প্রকাশিত হয়। এতে গান আছে কিন্তু গানের ভূমিকা এ নাটকে উল্লেখযোগ্য নয়। গান গতানুগতিকভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে।

২য় দৃশ্যে সখীদের গান 'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়',

৫ম দৃশ্যে সখীদের গান 'বাজিবে সখী বাজিবে' ও

'ঐ বুঝি বাঁশি বাজে' কুমার সেন-ইলার প্রেমের গান।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ দৃশ্যে ইলার গান 'আমি নিশিদিন তোমার' ।

বিসর্জন

বিসর্জন (১২৯৭) রাজর্ষি উপন্যাসের পরিমার্জিত নাট্যরূপ। এ নাটকে গানের অবকাশ কম। তবে এতে কয়েকটি গান আছে।

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে অপর্ণার গান 'আমি একেলা চলেছি এ ভবে',

৫ম দৃশ্যে পুরাসীদের গান 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে',

২য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে অপর্ণার গান 'ওগো পুরবাসী আমি দ্বারে',

৩য় দৃশ্যে জয়সিংহের গান 'আমারে কে নিবি ভাই সঁপিতে চাই',

৩য় অঙ্কের ১ম দৃশ্যে প্রজাদের একটি গান আছে। তবে কোন গানই নাটকের জন্য আবশ্যকীয় নয়।

গোরায় গলদ

গোড়ায় গলদ (১২৯৯) রবীন্দ্রনাথের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রহসন। এই নাটকে গান ব্যবহারের সুযোগ রবীন্দ্রনাথ তেমন গ্রহণ করেন নি। গোড়ায় গলদ-এর শেষ দৃশ্যে একটি মাত্র গান আছে সমবেত কণ্ঠে ঃ 'সব অদৃষ্টে যেমন জুটুক তোমরা সবাই ভালো'।

প্রজাপতির নির্বন্ধ

প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৩০৭-০৮ সালে ভারতীতে 'চিরকুমার সভা' নামে প্রকাশিত হয়। এটি উপন্যাস বিভাগের অন্তর্গত হলেও চিরকুমার সভার রূপান্তর প্রজাপতির নির্বন্ধ মূলত নাটকই। এই নাট্যবৈশিষ্ট্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ এটিকে সম্পূর্ণ নাটকে পরিণত করেছিলেন। এর গানগুলি পূর্ণ কাব্যগীতি রচনার ঢঙে রচিত হয়নি, প্রহসনের প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত ও সংলাপধর্মী গান সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে। তবে এই নাটকের কয়েকটি গান যেমন,

'অলকে কুসুম না দিও',

'কেন সারাদিন ধিরে ধিরে,

'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়' প্রভৃতি কাব্যসঙ্গীতের মর্যাদা পায়।

Dhaka University Institutional Repository

বিনি পয়সার ভোজ

ব্যঙ্গকৌতুক-এর (১৩১৪) অর্ন্তগত প্রহসন বিনি পয়সার ভোজ-এ একটি চমৎকার কৌতুকসঙ্গীত আছে।যেমন-

'যদি জোটে রোজ

এমন বিনি পয়সার ভোজ

ডিশের পরে ডিশ

শুধু মাটন কারি ফিস

সঙ্গে তারি হুইস্কি সোডা দু-চার রয়াল ডোজ' ।

এর অন্তর্গত বশীকরণ নাটিকায় গান আছে দুটি-

'আমি কি বলে করিব নিবেদন' ও

'এবার সখি সোনার মৃগ দেয় বুঝি ধরা' ।

শারদোৎসব

রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ঋতুসঙ্গীত রচনার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রচনা শারদোৎসব (১৩০৫)। এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের ঋতু-সঙ্গীতের প্রকৃত সূচনা। শারদোৎসব নাটকে গান আছে মোট ৯টি। প্রথম দৃশ্যে বালকদের কণ্ঠে গান আছে একটি:

'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই আজ আমাদের ছুটি।'

দ্বিতীয় দৃশ্যে বালকদলের গান:

'আজ ধানের ক্ষেত্রে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা।'

ঠাকুর দাদা ও বালকদলের সমবেত গান:

'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা বেঁধেছি শেফালি মালা
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা', ও

'আমার নয়ন-ভুলানো এলে
আমি কী হেরিলাম হৃদয়ে মেলে।'

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুর দাদা গেয়েছেন:

'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান'

সন্ন্যাসীর কণ্ঠে গান আছে তিনটি:

'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ'

'নবকুন্দধবলা সুশীতল' ও

'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'।

বৌঠাকুরানীর হাট

বৌঠাকুরানীর হাট-এর নাট্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয় এবং পুন:লিখিত হয়ে ১৩৩৬ সালে **'পরিত্রাণ'** নামে প্রকাশিত হয়। বৌঠাকুরানীর হাট উপন্যাসে অনেকগুলি গান আছে, প্রায়শ্চিত্তেও রবীন্দ্রনাথ সেসব গান ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র সন্নিবেশের মাধ্যমে একটি নতুন সাংগীতিক মাত্রাও যুক্ত হলো এ নাটকে। তখন রবীন্দ্রনাথের জীবনে সঙ্গীত সৃষ্টির এক নতুন পর্যায় চলছে। হাতে একতারা ও কণ্ঠে গান নিয়ে আবির্ভূত হলেন যে ধনঞ্জয় বৈরাগী, তিনি রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ। উপন্যাসের বসন্ত রায়ের গানগুলো নাটকেও রক্ষা পেয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই গানের ভাষার কিছু কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন

'বধূঁয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ' গানটি বিশেষভাবে পরিমার্জিত হয়েছে। তাতে গানটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'মলিন মুখে ফুটুক হাসি' ও

'আজ তোমারে দেখতে এলেম' গান দুটিও পরিমার্জন করা হয়েছে। ধনঞ্জয়ের গাওয়া গানসমূহ এ নাটকের বিশেষ সম্পদ।

'আরো আরো প্রভু আরো আরো',

'আমাকে যে বাঁধবে ধরে',

'বাঁচান বাঁচি, মারেন মারি',

'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়',

'ওরে আগুন আমার ভাই',

Dhaka University Institutional Repository

'রইল বলে রাখলে কারে' প্রভৃতি গানের ভেতর দিয়ে ধনঞ্জয়ের হৃদয়াবেগ আমাদের স্পর্শ করে যায়। এ নাটকের সর্বশ্রেষ্ঠ গান

'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ'।

রাজা

রাজা (১৩১৭) রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংকেতিক নাট। সাংকেতিক রহস্য উন্মোচনের জন্য এ নাটকে গানের ব্যবহার ঘটল, যা আগেকার নাটকসমূহে গানের ব্যবহার অপেক্ষা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পৃথক। এ নাটকখানি রবীন্দ্রজীবনের গীতাঞ্জলী পর্বে রচিত। সে সময়কার বহু কবিতায় ও গানে রবীন্দ্রনাথ ত্রিভুবনেশ্বরকে রাজা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রাজার যাবতীয় ঐশ্বর্য ও প্রতাপ পরমেশভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রাজা-য় গান সংখ্যা ২৬।

সুরঙ্গমার গান ৮টি,

রাজার গান ২টি,

সুদর্শনার গান ১টি,

ঠাকুর দাদা ও অনুচরবৃন্দের গান ১১টি,

বাউল ও পাগলের গান ৩টি ও

বালকের গান ১টি।

নাটকের প্রথম গানটি নেপথ্য থেকে রাজার গাওয়া: 'খোলো খোলো দ্বার'।

এই নাটকের কতগুলি গান যেন সমগ্র নাটকের ভাবগৃন্থিটিকে খুলে দেয়।

সুরঙ্গমার------- 'এ যে মোর আবরণ',

'অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ',

ঠাকুরদাদার -----'আমরা সবাই রাজা',

বাউলের --------'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে',

ঠাকুর দাদা'র----'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা',

সুদর্শনার--------'কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে',

রাজার---------- 'আমি রূপে তোমায় ভুলবনা', প্রভৃতি গানগুলি এই পর্যায়ের।

Dhaka University Institutional Repository

অচলায়তন

১৩১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের নাটক অচলায়তন প্রকাশিত হয়। এটি রূপক নাটক। এ নাটক রাজার মত কোন অধ্যাত্মতত্ত্ব অবলম্বনে রচিত হয়নি। হিন্দু সমাজের আচার-সর্বস্ব রক্ষণশীলতা এতে সমালোচিত হয়েছে। এ নাটকেও গানের ব্যবহার যথেষ্ট গরুত্ব পেয়েছে। এই নাটকে ২৩টি গান ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চক একাই গেয়েছে ১২টি গান। প্রথম দৃশ্যের সূচনাতেই

'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে'

এই গানটি গেয়ে পঞ্চক নাটকের মূল বক্তব্যের আভাস দেয়। রুদ্ধভবনে আবদ্ধ প্রাণের কাছে মুক্তির উদার আহ্বান ধ্বনিত হয়ে ওঠে। পঞ্চক দুই ধরনের গান গায়। এক ধরনের গান হচ্ছে:

'তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে',

'দুরে কোথায় দুরে দুরে',

'এ পথ গেছে কোনখানে',

'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে',

'আমি কারে ডাকি গো',

'সকল জনমভরে ও মোর দরদিয়া'। এগুলো বিষাদের গান। আবার আর এক ধরনের গান হচ্ছে:

'আজ যেমন করে গাইছে আকাশ',

'এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে',

'হা রে রে রে রে রে রে আমায়',

'ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে',

'আর নহে আর নয়' প্রভৃতি। এগুলো আনন্দ ও উল্লাসের গান। এই নাটকে দাদাঠাকুর গান গেয়েছেন দুটি। গান দুটি যথাক্রমে

'আমরা চাষ করি আনন্দে' ও

'যিনি সকল কাজের কাজি মোরা তাঁরই কাজের সঙ্গী'।

দর্ভক দলের গাওয়া-

'উতল ধারা বাদল ঝরে' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত বর্ষাগীতি।

Dhaka University Institutional Repository

অচলায়তনের বালক কণ্ঠে গীত হয়েছে 'আলো আমার আলো ওগো' গানটি। কবি চরাচরাব্যাপ্ত আলোর আভাসকে বিচ্ছুরিত করেছেন এই গানে। রাজা অন্ধকারের নাটক, অচলায়তন আলোর। আলোর গানে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এই নাটকের মর্মতল।

মুক্তধারা

১৩২৯ সালে মুক্তধারা নাটকটি প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সম্পর্ক আছে। প্রায়শ্চিত্তের ধনঞ্জয় বৈরাগীকে এ নাটকেও দেখা যায়। মুক্তধারার প্রথম নাম ছিল পথ। রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র থেকে তা জানা যায়। কবি লিখেছিলেন:

'এ নাটকটা প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম পথ। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে যার কেউ নেই- সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।'

প্রায়শ্চিত্ত নাটকের 'আরো আরো প্রভু';

'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়',

'আমাকে যে বাঁধবে ধরে',

'রইল বলে রাখলে কারে',

'আগুন আমার ভাই' প্রভৃতি গান মুক্তধারাতেও ব্যবহার করা হয়েছে।

'ওতো আর ফিরবে না রে' গানটিও 'আমি ফিরব না রে' গানটির রূপান্তর। এই নাটকে ভৈরবপন্থীদের গান-

'জয় জয় ভৈরব জয় শঙ্কর

জয় জয় প্রলয়ঙ্কর শঙ্কর শঙ্কর', গানটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

ফাল্গুনী

১৩২২ সালে রবীন্দ্রনাথের নাটক ফালগুনী প্রকাশিত হয়। এটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের বলাকা পর্বের নাটক। রাজা ছিল গীতাঞ্জলি যুগের রচনা। ফাল্গুনী তাই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একটি নাট্যোপহার। এতে সঙ্গীতের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম দৃশ্যের গীতিভূমিকায় বেণুবনের গান:

Dhaka University Institutional Repository

'ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া

দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে।'

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতিভূমিকায় রয়েছে দূরন্ত প্রাণের গান:

'আমরা খুঁজি খেলার সাথি।'

এর পরে রয়েছে শীত বিদায়ের গান:

'ছাড় গো তোরা ছাড় গো

আমি চলবো সাগর পার গো।'

এর পরই রয়েছে নবযৌবনের গান:

'আমরা নুতন প্রাণের চর

আমরা থাকি পথে ঘাটে

নাই আমাদের ঘর।' ইত্যাদি। ফালগুনী নাটকের পূর্ণ গীতসন্নিবেশ এরূপ: সূচনা-রাজ্যোদ্যান-গান:

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে

ডাক দিয়ে সে যায়।

প্রথম দৃশ্য-

নবীনের আবির্ভাব-বেণুবনের গান:---ওগো দখিন হাওয়া পথিক হাওয়া,

পাখির নীড়ের গান:----------আকাশ আমার ভরল আলোয়;

ফুলন্ত গাছের গান:----------ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা;

যুবকদলের গান:----------ওরে ভাই ফালগুন লেগেছে বনে বনে,

যুবকদল ও সর্দারের গান:---------- আমাদের পাকিবে না চুল গো;

আমাদের ভয় কাহারে।

দ্বিতীয় দৃশ্য-

দুরন্ত প্রাণের গান:----------আমরা খুঁজি খেলার সাথী,

শীত বিদায়ের গান:----------ছাড় গো তোরা ছাড় গো;

নবযৌবনের গান:----------আমরা নুতন প্রাণের চর;

উদভ্রান্ত শীতের গান:----------ছাড় গো আমায় ছাড় গো;

Dhaka University Institutional Repository

যুবকদল ও চন্দ্রহাসের গান:--------আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে;

চলি গো চলি গো যাই চলে;

ভালো মানুষ নইরে মোরা।

তৃতীয় দৃশ্য-

বসন্তের হাসির গান:----------ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি;

আসন্ন মিলনের গান:----------আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি।

যুবকদল:----------মোরা চলবা না;

বাউল:----------ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে।

চতুর্থ দৃশ্য-

প্রত্যাগত যৌবনের গান:----------বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম;

নুতন আশার গান:----------এই কথাটাই ছিলেন ভুলে;

বোঝাপড়ার গান:----------এবার তো যৌবনের কাছে;

নবীন রূপের গান:----------এত দিন যে বসেছিলেম:

যুবকদলের গান:----------তুই ফেলে এসেছিল কারে;

আমি যাবনা গো অমনি চলে;

বাউলের গান:----------সবাই যারে সাব দিতেছে;

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা;

যুবকদলের গান:----------চোখের আলো দেখেছিলেম চোখের বাহিরে;

বাউলের গান:----------হবে জয় হবে জয় হবে জয় রে;

তোমায় নতুন করেই পাব বলে;

সমবেত উৎসবের গান:----------আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে। এই নাটকে সব চরিত্রেরর মুখে গান নেই। শুধু নবযৌবনের প্রতীক যারা তাদের কণ্ঠেই গান। তাই যুবকদল ও বাউল এতো সঙ্গীতময়। ফালগুনী ঠিক নাটক নয়, গীতিনাট্যও নয়, একে কথার গ্রন্থনায় গানের সমারোহ বলা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণশোধ

শারদোৎসবের রূপান্তর (১৩২৮)। এই নাটকটিকে শারদোৎসব অপেক্ষা অনেকাংশে পরিবর্তিত করা হয়েছে। শারদোৎসব নাটকে তত্ত্বমুখীনতার সুতীব্র ছাপ পড়েনি। কিন্তু শারদোৎসব অবলম্বনে রচিত ঋণশোধ গভীরভাবে তত্ত্বনাট্য। শারদোৎসবে ভূমিকায় প্রদত্ত গান 'বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে' ছাড়া মোট গান ছিল নয়। ঋণশোধে ভূমিকার গান ছাড়া মোট গানের সংখ্যা এগার। এই নাটকে শারদোৎসবের কয়েকটি গান বাদ পড়েছে ওই নতুন কয়েকটি গান সংযোজিত হয়েছে।

'তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ' ও
'লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া'

সন্ন্যাসীর কণ্ঠে গাওয়া শারদোৎসবের এই গান দুটি ঋণশোধে শেখরের গানে পরিণত হয়েছে। ঠাকুরদা ও বালকদের সমবেত সমাপ্তি সঙ্গীত এখানে শেখর ও বালকেরা সমবেতভাবে গেয়েছে। ঋণশোধের ভূমিকা সঙ্গীতটিও নতুন:

হৃদয়ে ছিলে জেগে
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল সরে
তোমার ঐ আঁচল খানি
শিশিরের ছোঁয়া লেগে।।
কী যে গান গাহিতে চাই
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ঐ শিউলি দলে
ছড়াল কানন তলে
সে যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে ।।

Dhaka University Institutional Repository

বসন্ত

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গিত রবীন্দ্রনাটক 'বসন্ত' প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের বসন্ত কালে। ফালগুনীর মতই বসন্তও ঋতু উৎসবের তত্ত্বনাটক। বসন্ত নাটকে গান আছে ২৩টি। অধিকাংশ গানই ঐ সময় রচিত। **'গানগুলি মোর শৈবালেরি দল'** বলাকার একটি কবিতার গীতিরূপান্তর। এই গীতিরাজির মধ্যে দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঋতুভাবনা ও তত্ত্বকে উপস্থাপিত করেন। এদের ভেতর দিয়েই অবারিত হয় তাঁর প্রকৃতি-চেতনা এবং এর সঙ্গে মেশামেশি করে থাকে তাঁর স্মৃতি ও প্রেমবেদনা।

রক্তকরবী

রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ থাকাকালে যক্ষপুরী নামে রবীন্দ্রনাথ প্রথম নাটকটি রচনা করেন। রক্তকরবীর গান সংখ্যায় সাতটি। বিশু এ নাটকের প্রধান গায়ক। যক্ষপুরীতে এসেও সে গান ভুলে যায়নি। নাটকের পাঁচটি গানই তার গাওয়া।

বিশুর প্রথম গান-

'মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে

লাগল পালে নেশার হাওয়া'। গানটি নন্দিনীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পরবর্তী-গান

'তোর প্রাণের রসতো শুকিয়ে গেল ওরে

তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে'। যক্ষপুরীর যন্ত্রণাদগ্শ মানুষের আর্তনাদ এই গানে ধ্বনিত হয়েছে। পরবর্তী যে গানটি বিশু নন্দিনীকে গেয়ে শোনায়-

'তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ

ওগো ঘুমভাঙ্গা নিয়া'- একটি শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত। ভালবাসার একটি অসামান্য গান এটি।

Dhaka University Institutional Repository

নন্দিনীর গান

ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দুরে
জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

এও একটি অসামান্যগান, যার মর্মে রয়েছে জীবনতৃষা, ভালবাসা। এই নাটকের নেপথ্য সঙ্গীত 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'। এটি ফসল কাটার গান। ফসল কাটার গান দিয়েই নাটক শেষ হয়েছে। এরও একটি প্রতীকি অর্থ আছে। লোভের চেয়ে, দম্ভের চেয়ে, শোষেণের চেয়ে, জীবনবিরোধী একাকিত্বের জালে আবদ্ধ থাকার চেয়ে প্রাণের, প্রেমের, জীবনের, সৌন্দর্য্যের, ঔদার্যের সাধন যে অনেক বড় সে কথাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে এই গানে। নাটকের মর্মতল থেকে উৎসারিত এই কণ্ঠ ফসল কাটার গান।

চিরকুমার সভা

চিরকুমার সভা উপন্যাস আকারে ভারতীতে (১৩০৭-১৩০৮) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর ১৩১৪ সালে প্রজাপতির নির্বন্ধ নামে প্রকাশিত হয়। কবি আবার এটিকে পরিবর্তিত করে নতুনভাবে নাট্যরূপ দান করেন। ১৩৩২ সালে তা চিরকুমার সভা নামে প্রকাশিত হয়

শোধবোধ

কর্মফল (১৩১০) গল্পটির নাট্যরূপ ১৩৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি লঘুরসের সামাজিক নাটক। এ নাটকে কয়েকটি গান আছে এবং এগুলো গান হিসেবে উৎকৃষ্ট। যেমন-

'সে আমার গোপন কথা শুনে যা ও সখী',
'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা',
'এবার উজাড় করে লও হে আমারে' ইত্যাদি। নায়িকা নলিনী এ সবের নায়িকা। গানগুলো সচরাচর নাটকে যেমন গান গাওয়া হয়ে থাকে, তেমনই। এর অতিরিক্ত কোন মূল্য এদের নেই। গৃহপ্রবেশ (১৩৩২) নাটকটি শেষের রাত্রি (১৩২১) গল্পের নাট্যরূপ। গল্পকে নাটকরূপে উপস্থাপিত করার সময় কয়েকটি গান যোজনা করা হয়েছে। এখানে

Dhaka University Institutional Repository

গান আছে মোট নয়টি। মৃত্যুশর্য্যায় শায়িত যতীন ক্রমশ অন্তিম পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই হচ্ছে নাটকের বিষয়। যতীনের অনুরোধে গাওয়া হিমির প্রথম গান-

'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি;
মনের ভিতর'।

পাশের ঘরে সে গাইল 'বাজো রে বাঁশরি বাজো'। তাতেও কাহিনীর কারুণ্য যেন আরো উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। দাম্পত্যজীবনের প্রাথমিক স্মৃতিতে যতীন উদ্বেল হয়ে উঠলে হিমিকে গাইতে বলে:

'যৌবন সরসীনিরে
মিলনশতদল।'

যতীনের মন যখন তার পত্নী মণির চিন্তায় উদ্বেল, মণি যখন তার কাছে নেই, তখন হিমির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় যতীনের ইচ্ছামত গান:

'আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী
নয়ন আমার কাঙ্গাল হয়ে মরে না ঘুরি।'

এরপর যতীন গাইল একটি বাউল সুরের গান:

'ওরে মন যখন জাগলি না রে
তখন মনের মানুষ এল দ্বারে।'

গুণ গুন করে কিনু বাউলের মুখে শোনা এই গানটি গেয়ে হিমিকে সে বলেছে যে, সে বুঝতে পারছে হিমির মন জেগেছে। কিন্তু এই জাগরণ পরিণতি লাভ করবে 'তুলবে তুফান হাহাকারে'। এখনা যতীনের চোখে গৃহপ্রবেশের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের বেদনাই ধ্বনিত হয় গানের সুরে।

হিমির পরবর্তী গান:

'ঐ মরণের সাগর পারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে'।

এই মৃত্যুবিষয়ক গানটি যতীনের আসন্ন মৃত্যুর বেদনাকে যেন চারদিকে উচ্ছসিত করে তুলছে। এরপর হিমি গাইছে-

'যদি হল যাবার ক্ষণ
তবে যাও দিয়ে যাও শেষের পরশন'।

কিন্তু শেষ স্পর্শ যে নিবেদন করবে সেই মণি নেই, সে পিতৃগৃহে যতীনের বহু প্রত্যাশিত অথচ কোন দিন যা সে চাক্ষুস করতে পারবে না সেই গৃহ প্রবেশকে নিয়ে হিমি গাইল:

Dhaka University Institutional Repository

'অগ্নিশিখা এসো এসো
আনো আনো আলো।'

যতীন ধীরে ধীরে মৃত্যুর গৃহে প্রবেশ করছে সেই বেদনাই এই গানের বাণীর বৈপরীত্যে তীব্র হয়ে ওঠে।

হিমির শেষ গান:

'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।'

অত্যসন্ন মৃত্যুর অসহ শোক এই গান তীব্র হয়ে উঠেছে। বস্তুত এই নাটকের সব বেদনাই গভীর হয়েছে গানে এখানেই গানের উপযোগিতা।

শেষ রক্ষা

দোড়ায় গলদ প্রহসনের (১২৯৯) নাট্যরূপান্তর শেষরক্ষা (১৩৩৪)। গোড়ায় গলদে শুধু মাত্র একটি সমাপ্তি সঙ্গীত ছিল। কিন্তু শেষরক্ষায় কয়েকটি গান যোজিত হয়েছে। তাতে নাটকটি সৌকর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। গোড়ায় গলদ ও শেষরক্ষার বিষয়বস্তু একই কিন্তু কয়েকটি চমৎকার গানের সংযোগে সেই বিষয়ের পরিবেশনা আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। এ নাটরেক গানগুলি মুখ্যত প্রেম সঙ্গীত। প্রথম গানটিই কমলের: 'ডাকিল মোরে জাগার সাথি'। এই গানের ভেতর দিয়েই কমল কবি বিনোদনের প্রতি তার অনুরাগ নিবেদন করেছে।

এর পরের গান ইন্দুর:----------'হায় রে, ওরে যায় না কি জানা',

এর দ্বিতীয় গান ----------'যাবার বেলা শেষ কথাটি যাও বলে',

এর পর নেপথ্য থেকে শোনা গেল---------'কাছে যাবে ছিল পাশে হল ন যাওয়া',

ইন্দুর গান ----------'লুকালে বলেই খুঁজে বাহির করা',

বিনোদের গাওয়া----------'মুখপানে চেয়ে দেখি ভয় হয় মনে',

চন্দ্রকান্তের গাওয়া ----------'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না', প্রভৃতি গান।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রেমসঙ্গীতের অন্তর্গত এসব গান।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। ফাল্গুনী, ঋণশোধ, প্রভৃতির মত শেষ বর্ষণের পালাও রাজসভাগৃহে সূচিত। এর কোন দৃশ্যান্তর নেই। একই স্থানে প্রারম্ভিক ও সমাপ্ত। বসন্তে মুখপাত্র ছিলেন কবি, শেষ বর্ষণে মুখপাত্র নটরাজ।এর প্রথম গানটি বর্ষার আবাহন। নটরাজের নির্দেশে গায়ক-গায়িকার দল গাইছে-

'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে
এসো করোস্নান নবধারাজলে'।

এর আগে বর্ষার আবাহনছলে নটরাজ বলেন:

"ঘনমেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী, কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জাগুক।" নটরাজ ধারাভাষ্য রচনা করেন, এবং তারই পর্যায়ে পর্যায়ে গাওয়া হয় গান। গানটি শেষ নটরাজ রাজাকে বলেন: "মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন,

"রজনী শাওন ঘন,
ঘন দেয়া গরজনে,
রিমঝিম শব্দে বরিষে।"

রাজার উক্তি, "ভিতরের দিকে। সেই দিকের পথই তো সবচেয়ে দুর্গম।" এবার নটরাজ জানান: "গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো সব গীতিরসিক আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝরো ঝরো'। তখন গায়ক-গায়িকার দল গান গাইল:

'ঝরে ঝরো ঝরো ভাদর বাদর
বিরহকাতর শর্বরী
ফিরিছে একোন অসীন রোদন
কানন কানন মর্মরী'।

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্রাণ

পরিত্রাণ নাটকটি প্রায়শ্চিত্তের নাট্যরূপন্তর। ১৩৩৬ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরিত্রাণ প্রায়শ্চিত্তের কোনো আমূল সংস্কার নয়। কাহিনী ও চরিত্রবিন্যাস অক্ষতই রয়ে গেছে। পূর্ববর্তী নাটকের অনেক গানই এতে আছে, তাছাড়া এতে ধনঞ্জয়ের পাঁচখানি গান ও নটীদের তিনখানি গান। ধনঞ্জয়ের মুখেও **'কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসার ঘায়ে'** গানটির সুখকর ব্যবহার ঘটেনি। ধনঞ্জয়ের আরো দু'একটি গানও যথেষ্ট ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠেনি। যেমন-

'তুমি বাহির থেকে দিলে বিষম তাড়া',
'আমার পথে পথেই পাথর ছড়ানো' পভৃতি ।

তপতী

রাজা ও রানী নাটকের নাট্যরূপান্তর তপতী ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। গান তপতী নাটকে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নাটকের আবেদন গানে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। লাহোর সেন্ট্রাল জেলে যতীন দাস অনশনে মৃত্যুবরণ করলে তার সংবাদ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন একটি বিখ্যাত উদ্দীপনামূলক গান:

'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধতাহ
হে ভৈরবশক্তি দাও ভক্তপানে চাহ'।

এটিকেই তপতী নাটকের প্রথম ও উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে ব্যবহার করা হয়েছে এই গানটি গেয়েছেন দেবদত্ত একদল উপাসক। বাকিগুলো গেয়েছে বিপাশা। এই চরিত্রটি তপতী নাটকে নতুন করে যোজিত। তপতীতে বিপশার কণ্ঠে **'প্রলয় নাচন নাচলে যখন'** গানটিও নৃত্যময় ভৈরবেরই বন্দনাসঙ্গীত।

নবীন

নবীন ১৩৩৭ সালে রচিত ও ১৩৩৮ সালে প্রকাশিত। গীতিনাট্যরূপে প্রচলিত হলেও এ রচনার কোন উল্লেখযোগ্য নাট্যবৈশিষ্ট্য নেই। এ হচ্ছে একক কথকতায় গ্রথিত ঋতুসঙ্গীতের সমষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

শাপমোচন

১৩৩৮ সালেই পৌষমাসে জোড়াসাঁকো ভবনে পাঠ ও নৃত্যগীত সহযোগে শাপমোচন প্রথম অভিনীত হয়। এর গানগুলি পূর্বরচিত নানা গীতিনাটিকা হতে সংকলিত। তবে এর জন্য কয়েকটি নতুন গানও কবি রচনা করেছিলেন। শাপমোচনের সূচনাসঙ্গীত-

'এ শুধু অলস মায়া এ শুধু মেঘের খেলা'।

মদ্ররাজকুলে মধুশ্রী জন্ম নিল কমলিকা নামে। তাদের জন্মান্তরীণ আত্মবিস্মৃত বিরহবেদনার গান

'জাগরণে যায় বিভাবরী'।

গান্ধারের রাজ অন্তঃপুরে কেমন করে কমলিকার ছবি এসে পড়ল। তা দেখে অরুণেশ্বরের মনে এল গান:

'ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে'।

ছবিখানি দিনের চিন্তা ও রাতের স্বপ্নের পরে আপন ভূমিকা রচনা করল গানে:

'তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা'।

রাজা চিঠি লিখলেন চিত্ররূপিনীর উদ্দেশ্যে:

'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে ব্যাথার মালা বরণমালা'।

সখীদের নিয়ে বারবার সে চিঠি পড়ল রাজকন্যা: 'দে পড়ে দে আমায় তোরা কী কথা আজ লিখেছে সে'। গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। সখীরা রাজকন্যাকে গিয়ে সে সংবাদ জানালে: বাজিবে সখী বাঁশি বাজিবে। চৈত্রপূর্ণিমা তিথিতে বিবাহরাত্রে রাজার বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলিয়ে উঠল। তার মনে পড়তে থাকলো লোকান্তরে এমনি রাতে কার সঙ্গে যেন দোলায় দুলছিলেন তিনি। সেই অস্পষ্ট স্মৃতি এল গান হয়ে:

'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা'।

রাজার প্রতিনিধি হয়ে হস্তীপৃষ্ঠে এল অরুণেশ্বরের বীণা। দূরোদ্দিষ্ট রাজার আবাহনসঙ্গীত গাইল সখীগণ:

'তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে এল গো।'

অরুণেশ্বরের বীণার সঙ্গে কমলিকার পরিণয়। বিবাহসঙ্গীত ধ্বনিত হল:

'বাজো রে বাঁশরি বাজো।'

Dhaka University Institutional Repository

বীণার সঙ্গে রাজকুমারীর মালা বদলের গান গাইল সখীরা:

'লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি।'

বধূ পতিগৃহে যাবার সময় সখীরা সুন্দরকে প্রণাম করে গাইল-

'রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাওগো এবার যাবার আগে'।

পতিগৃহে এল রাজবধূ। রাজা থাকেন অন্ধকার গৃহে। রাজা তাকে চাক্ষুস দেখা দেন না। আগে অন্তরে দেখে নিতে বলেন, তার গানের মধ্যেই তাকে দেখতে বলেন:

'কোথা বাইরে দুরে যায়রে উড়ে হায়রে হায়'।

একদিন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে কমলিকা তার সুগন্ধি চুলে রাজার দুই পা ঢেকে মিনতি জানাল তাকে দেখবার জন্য। না হয় সে বিদায় নিতে চাইল অন্ধকারের বুকে তার কান্না রেখে গিয়ে। তখনকার গান:

'আমি এলেম তোমার দ্বারে'।

রাজা বললেন রাণী যেন না দেখার নিবিড় মিলনকে নষ্ট না করেন। রাণী এখনো আনমনা, তাই শুভদৃষ্টির সময় এখনো আসেনি। তখনকার গান:

'আনমনা গো আনমনা,

তোমার কাছে আমার বীণার মাল্যখানি আনবনা'।

রাণীর মনে খেদ থেকেই যায়, সেকি কোনদিন রাজাকে দেখতে পাবে না? রাজা জানালেন পরেরদিন চৈত্রসংক্রান্তিতে নাগকেশরের বনে নৃত্য হবে। রাণী যেন প্রসাদ শিখরে থেকে চেয়ে দেখেন। কিন্তু রাজাকে রাণী চিনবে কেমন করে? রাজা বললেন যেমন খুশি কল্পনা করে নিতে। তখনকার গান:

'হায়রে, ওরে যায় না কি জানা।'

চৈত্রসংক্রান্তির রাতে রাণী সেই নাচ দেখলেন। কিন্তু নৃত্যসভায় একজন কুশ্রীর অংশগ্রহণ তার মনকে পীড়িত করল। রাজা সেই শ্রীহীনের জন্য করুণা দাবি করলেন রাণীর কাছ থেকে। তিনি গাইলেন:

' বাহির ভুল ভাঙ্গবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙ্গবে কি।'

রাণীর আকাঙ্খা মত রাজা দেখা দিলেন তাকে। কিন্তু শ্রীভ্রষ্ঠতার আঘাত সইতে পারলেন না রানী, তিনি ঘর থেকে ছুটে পালালেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা তাকে ডাক দিয়ে গাইলেন:

'না যেয়োনা যেয়ো নাকো
মিলনপিয়াসি মোর কথা রাখো'।

কিন্তু রাণী চলে গেলেন বহুদূরে, বনের মধ্যে যে মৃগয়াগৃহ আছে রাজার সেই খানে। মধ্যরাতে শোনা যায় বীণাধ্বনি, চিরবিরহের সঞ্চিত অশ্রু বুকের মধ্যে উছলে ওঠে। রাণী গেয়ে ওঠেন:

'সখী আঁধারে একেলা ঘরে মন মানেনা'।

রাতের পর রাত যায়। রাণী মনে ভাবেন যখন তিনি কাছে এলেন তখন ছিল কৃষ্ণসন্ধ্যা, যখন চাঁদ উঠল তার মালাখানি রইল তিনি রইলেন না। রাণীর গান:

'যখন এসেছিলে অন্ধকারে'।

রাণীর ঘুম নেই। বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাল কালাঙড়া। বীণাধ্বনি আজ বাইরে নেই, এসেছে তার অন্তরে তন্তুতে তন্তুতে। রাণীর গান:

'ওই বুঝি বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনোমাঝে'।

রাণীর মন ছুটে চলে তারই পানে, দেখার আগে যাকে চিনেছিলেন, দেখার পর যাকে ভুলেছিলেন। একদিন তিনি বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালেন বাতায়নের কাছে। নিচে সেই ছায়ামূর্তির নাচ, বিরহের সেই উর্মিদোলা। তখনকার গান:

'ওকি এল ওকি এলনা বোঝা গেলানা।'

নাচ দেখালেন রাণী। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবছে অন্ধকারের তলায়। তিনি মনস্থির করলেন, দৃষ্টিকে আর ভয় নেই, তিনি যাবেন রাজসন্দর্শনে। তখনকার গান:

'মোরে বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি'।

প্রদীপ তুলে ধরে রাজার মুখখানি দেখলেন রাণী। কী সুন্দর মনে হল রাজার রূপ তার কাছে। তিনি গাইলেনঃ

'বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'।

এই মিলনের মধ্য দিয়েই শাপমোচনের সমাপ্তি। এ কোন অধ্যাত্ম নাটক নয়। এ নাটক রোমান্টিক, প্রকৃত প্রেম যে রূপমোহের অন্তরালবর্তী, সে কথাই বলা হয়েছে এখানে। সেই মহান অনুভবের প্রতি কমলিকাকে এগোতে হয়েছে ক্রমে ক্রমে। দেহের শাপকে মোচন করে তিনি অদেহ সুন্দরের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। গানই এ রচনার প্রাণ। কথকতা সামান্য, গানেই সকল অভিব্যক্তি অতি গভির ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্র গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য
ও
রূপক-সাংকেতিক নাটক

বাংলা সাহিত্যে কাব্য বলতে শুধু কবিতা বোঝায় এবং কবিতার রচয়িতাকে বলা হয় কবি। সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন, 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম' অর্থাৎ যে বাক্যে রস আছে তাই কাব্য। এখানে এমন কথা বলা হয়নি যে, শুধু ছন্দোবদ্ধ বাক্যকেই 'কাব্য' আখ্যা দেওয়া হয়, রসাত্মক বাক্যময় গদ্যরচনাও কাব্যপদবাচ্য। এই পদবাচ্যের অর্থসূত্র ধরেই সংস্কৃত আলংকারিকরা কাব্যকে শ্রব্য ও দৃশ্য-এই দু'ভাবে ভাগ করেছেন।

শ্রব্যকাব্য পদ্য, গদ্য ও চম্পু এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, কোশকাব্যপদ্যের, কোশ ও আখ্যায়িকাগদ্যের এবং গদ্য ও পদ্যমিশ্রিত রচনা চম্পুর অন্তর্গত। লেখার প্রচলন ও লেখাকে স্থায়ী এবং সাধারণ্যে প্রচার যোগ্য করবার পূর্ববর্তীকালে এই তিন শ্রেণীর কাব্য আবৃত্তি করা হতো, সুর করে পাঠ করা হতো। শ্রোতারা শুনে বিষয়বস্তুর রস উপভোগ করতেন। আর যেখানে আসরে বসে পাত্রপাত্রীর মুখভঙ্গি দেখে কণ্ঠ শুনে কাব্যের সম্পূর্ণ আস্বাদন করা অপরিহার্য ছিলো, ব্যাচার্থগত তাই হলো দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য বলতে মূলত নাট্য সাহিত্যই বোঝাত।

দৃশ্যকাব্যের দুটি ভাগ– রূপক এবং উপরূপক। রূপকের আবার দশটি উপবিভাগ আছে, উপরূপকের আঠারেটি। কিন্তু বর্তমানে রূপক কথাটাকে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি প্রাচীনকালে সে অর্থে ব্যবহৃত হতো না। যত রকম পদ্ধতিতে দৃশ্যকাব্যের উপস্থাপনা হতে পারে, সেদিক থেকে কোন রকমের ত্রুটি যাতে না থাকে, সেজন্যেই এ ধরনের উপবিভাগের প্রয়োজন হয়েছিলো বলে মনে করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত শাস্ত্রের 'নাট্যবেদ' কথাটিতে নাটককে বেদ বলা হয়েছে এ কারণে যে, ঋগ্বেদ থেকে কথোপকথন, সামবেদ থেকেসঙ্গীত, যজুঃ থেকে ভাবকল্পনা এবং অর্থব থেকে সাজসজ্জাদির উপকরণ সংগ্রহ করে নাট্যবেদ রচিত হয়েছে।

নাট্যবেদ বা গান্ধর্ববেদের আদি নির্দশন হিসাবে ভারতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্র এই নাট্যকারদের প্রধান অবলম্বন। ভারত নাট্যশাস্ত্রের মোট ৩৭টি অধ্যায়ে দৃশ্য-কাব্য বা অভিনয়কলার আলোচনাসূত্রে সঙ্গীত, ছন্দ বাচনভঙ্গি, ভাবব্যঞ্জনা ও নাটকীয় সিদ্ধ লক্ষ্য ইত্যাদির প্রয়োগরীতি বিশেষত নাট্যকলায় ভাব, রাগ ও তালের রসনৈপূণ্য এবং গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্য্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে নাটক নেই। কিন্তু পুরুরবা ও উবর্শী সংবাদ (ঋ ১০.৯৫) এবং যম-যমী সংবাদ (ঋ ১০.১০)– ভাবানুভূতির ব্যঞ্জনায়, কল্পনার ঐশ্বর্য্যে নাটকীয় দ্বন্দেরব ও রসমাধুর্য্যে নাট্যকাব্যের নিদর্শনরূপে পরিগণিত। জীবনের সাধ ও সাধনা এবং জীবনে বন্ধনমুক্তির আবেগ ক্ষণকালের সংলাপসূত্রের মাধ্যমে চিরকালের সামগ্রী হয়ে সাহিত্যে ধরা দিয়েছে।

প্রাকৃতভাষায় লেখা **'কর্পূরমঞ্জরী'** কবিতা ও সঙ্গীতবহুল ছিলো। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতি ও মানবের সম্বন্ধে বিভিন্ন রূপকল্পে তুলে ধরা হয়েছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা, বিক্রমোবশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত এবং ভবভূর্তির উত্তররামচরিত ও মালতীমাধব–এ নাটকগুলোতে মানবহৃদয়ের আশানিরাশা, সুখদুঃখের অন্যতম ব্যঞ্জনা নিয়ে পাঠক ও দর্শকের হৃদয়সংবেদ্য হয়েছে।

আদি মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে 'নাটকীয় ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। কবি রাধাকৃষ্ণ ও বড়াইর সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যের ন্যায় সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।'

চৈতন্যদেবের সময়ে রায় রামানন্দের **'জগন্নাথবল্লভ'** এবং রূপগোস্বামীর **'বিদগ্ধমাধব'** (সংস্কৃত নাটক) অভিনীত হয়েছে। বৃন্দাবনদাসের **'চৈতন্যভাগবত'** থেকে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের জন্মের সময় লোকে রাত জেগে মনসার গান শুনত, চন্ডী-বাশুলীর গান গাইত, শিবের গান গেয়ে ভিক্ষা করতো। যোগীপাল মহীপালের গানও গাইতো। কৃষ্ণলীলার গান তখন সাধারণ লোকের প্রিয় পালা ছিলো। তখন থেকে লোকসাহিত্যের প্রধান রূপ ছিলো গীত ও পাঁচালি।

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচালি ছিলো এক ধরনের গান বৃত্তির নাম-কখনো তা মৃদঙ্গ, মন্দিরা, চামর সহযোগে গীত হতো। একজন মাত্র 'গায়েন' কখনো গাইতো, কখনো দ্রুত আবৃত্তি করতো, মাঝে মাঝে নাচতও। অন্যেরা দোহার হিসেবে হত তার সহযোগী। অবশ্য নৃত্য-গীত সম্বলিত উত্তর-প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণলীলাও অভিনীত হত -তার নাম ছিলো নাটগীত। স্বয়ং চৈতন্যদেবও **'রুকিরনীহরণ'** নামের এমনি এক নাট্যের রুকিরনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

পালাগান, কৃষ্ণলীলা, পাঁচালি, কথকতা, যাত্রা, ঝুমুর ইত্যাদি নৃত্যগীত বহুল লোকাভিনয় (Folk-drama) সপ্তদশ, অষ্টাদশ, এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতেও বাঙ্গালির রসপিপাসুচিত্তে অনাবিল আনন্দ বর্ষণ করতো। জাগতিক অভাব-বেদনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা ক্ষণকালের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে মনকে সজীব করে নেবার অবকাশ পেতো।

উক্ত আলোচনা থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, গীতিনাট্য (নাট গীতি নামেও যা অভিহিত ছিলো)। নামে বেশ কয়েক রকম নাটকের প্রচলন আমাদের দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে।

যে নাট্যে সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীতেরও অবতারণা থাকে এবং সঙ্গতই সংলাপেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেগুলো গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথের **শারদোৎসব** (১৯০৯), **অচলায়তন** (১৯১৫) **ফাল্গুনী** (১৪১৮) এসব রূপক-সাংকেতিক নাটকের মূলভাব অধিকতর তাৎপর্যময় করে তুলতে গানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এক ধরনের গীতিনাট্য আছে, যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের কথাবার্তা সুরে রচিত। রবীন্দ্রনাথের **বাল্মিকী-প্রতিভা** (১৮৮১) কালমৃগয়া (১৮৮২), **মায়ারখেলা** (১৮৮৩) এ ধরনের গীতিনাট্য। গীতিনাট্যে নৃতের প্রচলনও আমাদের দেশে বহুকাল থেকে চলে আসছে। লোকাভিনয় তার প্রমাণ। হৃদয়াবেগকে সাধারণ সংলাপে যত না সুন্দর করে অভিব্যক্ত করা যায়, তার চেয়ে বেশী সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তোলা যায় কবিতার ছন্দে, সাংগীতিক ব্যঞ্জনায় তা হয়ে ওঠে অপূর্ব রসাত্মক। নাটকে দেহছন্দের নৃত্যভঙ্গি আরও বেশী চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। এজন্যেই আমাদের দেশে নাচ ও গান গীতিনাট্যের অংশরূপে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের **নটীরপূজা** (১৩৩৩), **শাপমোচন** (১৩৩৮), **চিত্রাঙ্গদা** নৃত্যনাট্য (১৩৪২) প্রভৃতি এ পর্যায়ের নৃত্যনাট্য।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য **'বাল্মিকী-প্রতিভা'** জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অভিনীত হয়। এ নাট্যরচনার মূলে ছিলো-

(১) বিহারিলাল চক্রবর্তীর **'সারদামঙ্গল'** কাব্যের চিত্রকল্প সম্বন্ধে কবির উপলব্ধি,

(২) হার্বার্ট স্পেনসারের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয় বস্তুর নাট্যিক উপস্থাপনার প্রয়াস

(৩) কবির সঙ্গীত রসপিপাসু চিত্তের সূক্ষ্ম অনুভূতি যার ফলে দেশী ও বিলেতি সুরের সংমিশ্রনে বাঙলা সঙ্গীতে নবতর সুর সংযোজনার এটি একটি নিরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা।

এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উল্লেখ্য ঃ

'বাল্মিকী-প্রতিভা' পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, উহা সঙ্গীতের একটি নূতন পরীক্ষা অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোন স্বাদ গ্রহণ সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মিকী-প্রতিভা তাহা নহে, সুরে নাটিকা, অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্য বিষয়কে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র, স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে'। (জীবনস্মৃতি)

'বাল্মিকী-প্রতিভা' গীতিনাট্য অভিনয়ের পর রবীন্দ্রনাথের চিত্তে এলো আত্ম-প্রত্যয় এবং গীতিনাট্য রচনার উদ্দীপনা। পর বৎসরই তিনি রচনা করেন দ্বিতীয় গীতিনাট্য **'কালমৃগয়া'** (১৮৮২)। এ গীতিনাট্য রচনার আগে এবং **'বাল্মিকী-প্রতিভা'** রচনার পরে, এক বৎসরে তিনি অপূর্ব উদ্দীপনা নিয়ে রচনা করেন কাব্যনাট্য **'রুদ্রচন্ড'** (জুন, ১৮৮১) এবং **'ভগ্নহৃদয়'** (জুন, ১৮৮১)। **'সন্ধ্যা সঙ্গীত'** কাব্য এ সময়েরই রচনা। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়ঃ

"বাল্মিকীপ্রতিভা' ও **'কালমৃগয়া'** যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। এ দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীত উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।... একটা দস্তুরভাঙ্গা গীতিপ্লিবের প্রলয়াবদ্ধ এ দুটি নাট্য লেখা। এই জন্য উহাদের মধ্যে তালবেতালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-বাংলার বাছবিচার নাই।' (জীবনস্মৃতি)

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'(১৮৮৩) রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক, যা গানের ধাঁচে ঢালা নয়, অথচ সঙ্গীতমুখর। এই নাটকটিতেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক-মানসের কাব্য রচনার কাছাকাছি সময়ে রচিত এবং প্রভাতসঙ্গীতের তত্ত্বটিই যেন নাট্যকারে সন্ন্যাসীর চরিত্রের মাধ্যমে এবং সাংগীতিক ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে 'জীবন স্মৃতিতে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্যঃ 'আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটি অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়অ বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহিরে হইতেই একটি মনের আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিলো- এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটি ভূমিকা। আমারতো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।... কাব্য হিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধের স্থান কি তাহা জানি না, আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানাবেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।'

বস্তুতঃ কবিরচিত বিভিন্ন পর্বের কাব্যেই নয়, গীতিনাট্য থেকে সাংকেতিক নাট্য এবং নৃত্যনাট্যের অনুক্রমণের মধ্যে রূপের মধ্যে অরূপাতীতের লীলারসধারার বিচিত্র ব্যঞ্জনা নানা রূপকল্পে সর্বত্রই ধরা দিয়েছে।

প্রকৃতির প্রতিশোধের দীর্ঘদিন পর **'মায়ারখেলা'** নামক গীতি রচিত হয়। কবিমানসের গীতিসুরটি এ নাট্যে অপূর্ব ছন্দে অভিষিক্ত। **'বাল্মীকী-প্রতিভা'** ও **'কালমৃগয়া'** যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, **'মায়ারখেলা'** তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের ওপর তার নির্ভর নয়, হৃদয়া এ নাট্যের প্রধান উপকরণ। **'মায়ারখেলা'** রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্ত ছিলো গানের রসে মন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮ সালের পঁচিশে বৈশাখে শান্তিনিকেতনে আত্মপরিচয়ের অভিজ্ঞতাসূত্রে বলেছিলেন, 'আমি সেই বিচিত্রের দূত। নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, ছবি আঁকি, যে আবিষ্কার বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর, আমি তারই দূত। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে, নৃত্যে, চিত্রে, বর্ণে বর্ণে, রূপে রূপে, সুখ-দুঃখের আঘাতে-সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দে- তাঁর বিচিত্র লীলের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ করেছি, তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপকগুলোকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার পর। এই আমার একমাত্র পরিচয়'।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং রূপক-সাংকেতিক নাট্যসহ সব ধরনের নাটকগুলোর বিশেষ লক্ষণীয় দিক গান। গীতিনাট্য রচনার বহুদিন পর কবি রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনা করলেও এ নাটকগুলোর মূল তাৎপর্য গানেই ব্যক্ত হয়েছে। এমনকি, ব্যঞ্জনাত্মক সংলাপগুলোও

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গীতে পুণর্বার রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুতঃ রূপক-সাংকেতিক নাটকের অর্থগৌরব তার গীতিগৌরবেই বিধৃত। এসব নাটকের আরেকটি গুণ চিত্রধর্মিতা। এ চিত্রধর্মিতার ব্যঞ্জনা গানের ভাষায় হয়েছে রূপময়। শারদোৎসবে নাটকে ১০টি, রাজায় ২৫টি, অচলনায়তনে ২৩টি, মুক্তধারায় ১৪টি, ফাল্গুনীতে ৩১টি, রক্তকরবীতে ৮টি, এবং তাসেরদেশ নাটকে ৩০টি গান আছে। এ গানগুলো নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আবার রূপক-সাংকেতিক নাটকের অধিকাংশ গানই হচ্ছে নৃত্যকেন্দ্রিক। বিশেষত **শারদোৎসব, রাজা, ফাল্গুনী** ও **তাসেরদেশ** এই রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলোর বেশ কটি গান নৃত্যের আবেগময়তা ও ছন্দসুষমায় মন্ডিত। গানের সঙ্গে নৃত্যে ভঙ্গি এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, নৃত্য ছন্দকে গানের সুর থেকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা হয়, তবে নাট্যচরিত্র তার আবেগময়তা হারায়।

রবীন্দ্রনাথের সহজাত মানসধর্মই ছিলো গীতি-প্রবণতা। এই প্রবণতাই তাঁর শৈশবচিত্তকে **'জল পড়ে পাতা নড়ে'**র দোলায় মুগ্ধ করেছিলো। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তাঁর শিক্ষারম্ভের নানা ঘটনার মধ্যে মনে পড়ার মতো চিরসুখকর স্মৃতি যদি কিছু থাকে, তবে ঐ **'জল পড়ে পাতা নড়ে'**র দোলাটুকু।

এরপর যে রহস্যমধুর স্মৃতি তাঁর কিশোর চিত্তে তিনি সযত্নে লালন করে ছিলেন এবং তাঁর জীবনের অনেক মুহূর্ত মধুর হয়ে উঠেছে সেই স্মৃতিমন্থনে, তা ছিলো ঠাকুর বাড়ির অনেককালের খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জ্যের শিশুতোষ ছড়া বলার শব্দচিত্র ও ছন্দ। কবি তাঁর **'জীবনস্মৃতি'**তে বলেছেনঃ

'এই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবি নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত ছিলো। এই যে ভূবন মোহিনী বধুটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিলো, ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত। ... বালকের মন যে মাতিয়া উঠিত এবং চোখের সামনে নানা বর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইতো তার মূল কারণ ছিলো সেই দুত উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা ও ছন্দের দোলা। শিশুকালের সাহিত্য রসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে।'

শৈশবের মুগ্ধ অনুভূতির সযত্নে লালন, ছন্দসচেতনতা, সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং অপ্রত্যক্ষের প্রতি কৌতূহল তথা কল্পনার রূপায়ণ কবির ভাববৈশিষ্ট্যেরই পরিচায়ক। উপরন্তু পারিবারিক

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মকানুন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাবে তিনি তাঁর অন্তরে লালিত অনুভূতিতে ধীরে ধীরে আপন মনন ও মনস্থিতার গুণে নানা রূপাধারে, নানা অবলম্বনে অভিব্যক্ত করেছেন।

শিশু-কবির বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ তো ছিলোই, বাড়ির ভিতরেও তিনি সর্বত্র যেমন খুশি চলাফেরা করতে পারতেন না। জীবনস্মৃতিতে কবি আরও বলেছেন,

'সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটা অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিলো যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ রস-শব্দ-গন্ধ দ্বারজানালার নানা ফাঁক-ফোকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইতো। সে যেনো গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেস্টা করিত। সেই ছিলো মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ। মিলনে উপায় ছিলো না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিলো প্রবল। আজ সেই খড়ির গন্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গন্ডি তবু ঘোঁচে নাই। দূর এখন দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।'

এজন্যেই তাঁর অন্তরের গভীরে নিতান্ত শৈশবে যে সত্য-উপলব্ধি বাসা বেঁধেছিলো সে উপলব্ধির মানস-পরিপক্কতা এবং উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার ক্রমানুবর্তনে অন্তর ও বাহির, সীমা ও অসীম, ব্যক্তি-আমি ও বিশ্ব-আমি-নানা রূপকল্পে নানা ভাব ও ভাষায় প্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। তাঁর সূক্ষ মননধর্মী শিল্পীমানস বিশ্ব বৈচিত্র্যের অন্তর্লীন গতি, শক্তি, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যকে ব্যবহারিক শিল্পকলার মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তুলবার প্রয়াস নিয়েছে। সুকুমার শিল্পের ব্যবহারিক কলা-কৌশল প্রয়োগের এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলনের উপযোগী পরিবেশ এবং ক্ষেত্র রবীন্দ্রনাথের ছিলো বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাট্য এবং নৃত্যনাট্য নিয়ে প্রয়োগধর্মী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবারও যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছেন। মঞ্চ পরিচালনা, দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও সঙ্গীতের উপযোগীতা আবহসৃষ্টি এবং একই নাটককে নবতর আঙ্গিক এবং নতুন চরিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে মঞ্চায়িত করবার কৌতূহল ও প্রয়াস অতিসচেতন শিল্প-বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলো আনন্দময় সৃষ্টি তৎপরতার শামিল।

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলো যদিও তাঁর জীবনের গোধূলি-পর্বের রচনা, তবু নৃত্যনাট্যের ভাবসূচনা রূপকনাট্যের সঙ্গেই সন্নিবিষ্ট ছিল বলে অনুমান করা যায়। ১৯১১ সনের ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন **'রাজা'** নাটকের অভিনয় করান, তখন তা দেখতে কলকাতা থেকে অনুরাগীরা অনেকেই এসেছিলেন। আগতদের মধ্যে ছিলেন **'প্রবাসী'** পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সীতাদেবী। তিনি তার স্মৃতিকথায় সেই অভিনয় সম্পর্কে লিখেছেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

'ছেলেদের গানগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিলো। তাহাদের মধ্যবর্তী ঠাকুরদারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যবর্তী ঠাকুরদারূপী কবিবরের নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। তিনি অতিসুন্দর নৃত্য করিতে পারিতেন।' পরবর্তী পূজার ছুটির পূর্বে সীতাদেবী শান্তিনিকেতন পূণরায় আসেন এবং তখন তিনি **'শারদোৎসব'** নাটকের অভিনয় দেখে লিখলেন, বালকদের গান ও নৃত্য তাঁর ভালো লেগেছে।

গানের সঙ্গে নাচের প্রতি কবির আকর্ষণ ও দক্ষতা কবি বিশেষভাবে আয়ত্ব করবার সুযোগ পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডে। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসবার (১৮৮০ খ্রীঃ) সঙ্গে সঙ্গে **'মানময়ী'** (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য) নাটকের অভিনয়ের সময় কবি **'আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি'** গানটি নাচের জন্যেই রচনা করেন এবং বিলেতি নাচের আঙ্গিকে নাচিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নাচকে শিক্ষার অঙ্গরূপে প্রয়োগ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ ২০ বছর সক্রিয় প্রয়াস নিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ বলেছিলেন যে, 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষক-অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীসমাজের সকলের মনকে নাচের অনুকুলে গড়ে তুলতে গুরুদেবকে তাঁর ৪০ বছর বয়স থেকে প্রায় ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত নানা নাটকের উপলক্ষ্যে সৃষ্টি করে নিজে নেচে, বারে বারে সকলকে বোঝাতে হয়েছিল যে, নৃত্যকলাও একটি উচ্চাঙ্গের শিক্ষণীয় বিষয়।'

নৃত্যকে কবি শুধু তাঁর মনের ক্ষণিক হৃদয়াবেগের উচ্ছাস মাত্র মনে করে ভালোবাসতেন না, এ যেন ছিলো **'তার জীবন বিকাশের একটি আবশ্যিক সত্য।'** এ কাজে তাঁর পূত্রবঁধু প্রতিমাদেবী কবিকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। শান্তিনিকেতনে নৃত্য-আন্দোলনের পরিণতিরূপে কবির জীবনের শেষ দিকে রচিত পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্যগুলো বাংলা সাহিত্যভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া এ যাবৎকালে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর আশ্রয়ে লালিত 'নৃত্য' ও 'নটী'কে রবীন্দ্রনাথই গৌরবোজ্জলে সাহিত্যের মধ্যে স্থান দিলেন । রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় আর্টের নামে সমাজ জীবনে নৃত্যকলা মর্যাদা লাভ করলো।

এ প্রসঙ্গে **'জাভাযাত্রীর পথে'** রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উল্লেখ্যঃ

'আমাদের দেশে একদিন নাট্য-অভিনয়ের সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিলো নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে, দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখবার রস দেবার জন্যেই

Dhaka University Institutional Repository

অভিনয়।' রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যও বস্তুত অতি উচ্চাঙ্গের অভিনব শিল্পরূপে। 'সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য- এই ত্রিবেণীসংগমে ইহার অভিনয় রসমন্দির প্রতিষ্ঠিত।'

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতকে সর্বদাই অখন্ডরূপে দেখেছেন। কবির মতে, সমগ্রকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলেও সেই বিচ্ছিন্নতাও সমগ্রেরই অংশ এবং বিশ্বলীলার রূপ-বিভূতি-

র সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। সঙ্গীত কাব্য বা নাটক প্রতিটি ধারারই বিবর্তন আছে, স্বতন্ত্র মহিমাও আছে। কিন্তু সেই ধারাগত বিবর্তন বা স্বতন্ত্র্যই একমাত্র সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। তার মধ্যেও বিধৃত আছে নিগূঢ় এবং ব্যপকতর তাৎপর্য। বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলে যা আলাদা বলে মনে হয়, সমগ্রভাবে দেখলে তার মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রও উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সত্য-উপলব্ধি সম্বন্ধে **'আত্মপরিচয়'**- এ বলেছেন

কাব্য সম্বন্ধে একথা বললেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে তা কবির রচনার সমস্ত ধারায়ই সত্যবলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কবিচিত্তের সহজাত ছন্দ সচেতনতা, তাঁর সূক্ষ সৌন্দর্য্য এবং শিল্পবোধ নানা বিবর্তনের মাধ্যমে কাব্য গীতিনাট্য রূপক-সাংকেতিক নাট্য এবং অবশেষে নৃত্যনাট্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে নব নব প্রকাশের মধ্যে পেয়েছেন বিরাট ব্যাপ্তি।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

'বাংলা গীতিনাট্য-নৃত্যনাট্য ও রবীন্দ্রনাটকের গান' শীর্ষক সামগ্রিক আলোচনায় যে বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধিতে আসে তা হল রবীন্দ্রনাথের শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত অন্তকরণ কে স্নিগ্ধ করে। মনকে নিয়ে যায় অসীমের দিকে, মনুষ্যত্বের দিকে। চিনিয়ে দেয় নিজেকে, মানুষকে, সমাজকে, দেশকে আর বিশ্বকে। শিল্পগুরু অবনীনন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষকে রবীন্দ্রনাথ যা দিয়ে গেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁর গান। মানুষকে রবীন্দ্রনাথের দান এত বিচিত্র ব্যাপক প্রচুর অমূল্য যে, তার মধ্যে কোন দান শ্রেষ্ঠ তা বলা বড় কঠিন। কিন্তু একথা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর গানের চেয়ে আর কোনো দান বড় নয়।' রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, 'এই পার্থিব জীবন ও পৃথিবীর মানুষকে আমি ভালোবেসেছি। এই ভালোবাসা রেখে গেলাম আমার গানের সুরে গেঁথে। মানুষ যদি আমায় মনে রাখে তবে এই গান দিয়েই রাখবে।' রবীন্দ্রগবেষক ড.সুধাংশুশেখর শাসমল লিখেছেন, রবীন্দ্রসাহিত্য বাকরূপের দিব্যশক্তিতে উদ্দীপিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত শব্দের মায়াপুরী। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র প্রতিধ্বনিত। কথা ও সুরে সমন্বিত রবীন্দ্রসংগীত কল্পান্তকালবাহী মানব চেতনাকে জাগ্রত করে। সে জাগৃতি শিল্পীজীবনে বয়ে আনে পরিপূর্ণতা বা চরম-স্বার্থকতা। পরমসত্যকে প্রকাশ করতে সাহিত্য না পারলেও সঙ্গীতই পারে। তার গানই সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা। রবীন্দ্রনাথ চিত্র ও সঙ্গীত এই দুটো উপাদানের মাধ্যমে মূর্ত ও বিমূর্তকে ছবি ও সুরের আকারে আনার স্বার্থক উপায় বলে মনে করেছিলেন। সঙ্গীতের গুরুত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহু কথা বলে গিয়েছেন। বলেছেন, 'মানুষের যে আনন্দ ও আত্মপ্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করে, সঙ্গীত তার শ্রেষ্ঠ বাহন।' সুর ও ছন্দের সম্মিলিত রূপই সঙ্গীত। স্বর-সমাহারের মনীষীরা সঙ্গীতকে ধ্বনির শিল্প মনে করে বলেছেন 'The beautiful in music consists of sounds artistically combined.'

রবীন্দ্রগানে যেমন বিভিন্ন ধারার গান এসে মিশেছে, রবীন্দ্রনৃত্যেও তেমনি বিচ্ছিন্ন নৃত্যের সমাবেশ ঘটেছে বটে কিন্তু কোন নৃত্যধারাতেই বাঁধাধরা নিয়ম মানা হয়নি। তাই শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে নৃত্যধারার প্রচলন করেন তা আধুনিক নৃত্যেরই একটি নতুন দিগন্ত। বিভিন্ন ধ্রুপদী নৃত্যধারার কিছু গ্রহণ কিছু বর্জনের মাধ্যমে তা তৈরী হয়েছিল আর নেপথ্যে ছিল শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবনের সহজ সরল নির্মল আনন্দের আবেগ এবং মানুষের প্রকাশ ধর্মিতার কিছু স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি এবং লীলায়িত ছন্দময়তা।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর যে সত্য-উপলব্ধি সাধারণ্যে জানিয়ে গিয়েছিলেন, তা নিছক উপলব্ধি মাত্র নয়, তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। কবির শিল্পীমানসে এই বিচিত্র জগৎ তার রূপরস সৌন্দর্যময়তা, আনন্দবেদনা, দুখদৈন্য, রসরহস্য এবং বাস্তবতা নিয়েই বার বার ধরা দিয়েছে। কবি এই গতিশীল জগতের বৈচিত্র্য বিচিত্রের দূতরূপে সঞ্চয় করে বিচিত্র রূপকগুলোকে নানা রঙ্গে-রসে সাজিয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল তৎপরতাকে রূপায়িত করেছেন। তাঁর প্রথম গীতিনাট্য **'বাল্মিকী-প্রতিভা'** থেকে শুরু করে রূপক সাংকেতিক নাট্যের ধারণাবর্তনে নৃত্যনাট্য **'শ্যামা'** পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে এ সত্যই ধরা পড়ে যে, রূপরস ও ছন্দের বৈচিত্র রবীন্দ্রনাট্যে অভিনব বৈশিষ্ট্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং রূপক সাংকেতিক নাট্যসহ সব ধরনের নাটকগুলোর বিশেষ লক্ষণীয় দিক গান।

জীবনের প্রথম লগ্নে রয়েছে গীতিনাট্যের পর্ব, শেষ পর্বে তার নৃত্যনাট্যের। মাঝে রয়েছে তার প্রতিভা বিকাশের বিচিত্র আয়োজন ও অভিজ্ঞতার পর্ব। শিল্প সৃষ্টির বিচারে এ সমাবেশের মধ্যে এমন এক অন্তর্নিহিত সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যা, রবীন্দ্রপ্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ণে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ সংগঠন। গীতিনাট্যগুলো তার প্রথম প্রয়াস হওয়ায় কবির ছন্দচেতনা অবিভাজ্য রূপ পায়নি, সেটা পেয়েছে নৃত্যনাট্যে। যেখানে নৃত্যের তালে তালে সবার অলক্ষ্যে আবির্ভাব ঘটে নটরাজের। উন্মুক্ত হয় মুক্তির রূপ, সৃষ্টি হয় অনির্বচনীয় মায়ালোক। রবীন্দ্রধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়েই এই লেখার ইতি টানা হচ্ছে।

'আমি পূর্বদেশের নানা স্থানে বেড়াবার কালে নৃত্যকলা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জাভায় বালীতে, শ্যামে, চীনে, জাপানে আমাদের দেশে কোচিন্ মালাবার্ মণিপুরে য়্যুরোপের ফোকডান্স এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গে আমি পরিচিত। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, বলবার অধিকার আছে। এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা করবো না যে, আমাদের আশ্রমে নৃত্যকলার ভিতরে সকল ধারা মিলিয়ে, তার পেছনে যে সাধনা, যে শিল্পবোধ রয়েছে এবং সমগ্রের সৌন্দর্যবিকাশ আছে তা যে কোনখানেই দুর্লভ।'

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

১. রবীন্দ্রসঙ্গীতে ক্রমবিকাশ বিবর্ধন– ড. দেব জ্যোতি দত্ত মজুমদার

২. গীতিনাট্য ও নিত্যনাট্য– প্রণয় কুমার কুন্ডু

৩. রবীন্দ্রসঙ্গীতায়ন– সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্পাদিত

৪. রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিবৃত্ত– সন্তুনাথঘোষ

৫. বাংলা গানের বিবর্তন– ড. করুণাময় গোস্বামী

৬. রবীন্দ্রনাথের রূপক সাংকেতিক নাটক– মঞ্জুশ্রী চৌধুরী

৭. সঙ্গীত সংস্কৃতিতে রবীন্দ্রনাথ– জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ

৮. রবীন্দ্রনাথ- শান্তিদেব ঘোষ

৯. রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা-শৈলজারঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

১০. রবীন্দ্রসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে- ডাঃ নিতাই বসু

১১. রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা-অমল মুখোপাধ্যায়

১২. গীতবিতান কালানুক্রমিক সুচি- ১ও ২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৩. রবীন্দ্রনাথ গবেষণা গ্রন্থমালা- প্রফুল্লকুমার দাস

১৪. গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক ভারতীয় নৃত্যধারা- শান্তিদেব ঘোষ

১৫. জীবন স্মৃতি-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬. জাভাযাত্রীর পত্র- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৭. রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ- প্রমথনাথ বিশী

১৮. শ্রবনগাঁথা-রবীন্দ্ররচনাবলী

১৯. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, কলকাতা, ১৩৭১

২০. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, কলকাতা, ১৯৫৯

২১. প্রভাকুমার গোস্বামী, বাংলা নাটকে গান, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৭১

২২. পথে ও পথের প্রান্তে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৩. রবী জীবনী (৫ম -৯ম) খন্ড-প্রশান্ত কুমার পাল

২৪. রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিভাগ-৩, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

২৬. ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গ খন্ড, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭১- বিমল রায়,

২৭. বাঙ্গালীর রাগ সঙ্গীত চর্চা, ফার্মা কে. এল. এল.এম. প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৭০ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়,

২৮. Thompson, Rabindranath Tagore Poet and Dramatist

২৯. 'বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র', অহীন্দ্র চৌধুরী

৩০. সঙ্গীত-চিন্তা, শান্তিদেব ঘোষ

৩১. 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ', মন্মথমোহন বসু,

৩২. 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক', শঙ্খ ঘোষ,

৩৩. অখন্ড গীতবিতান

৩৪. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খন্ড পূবার্ধ, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭০, সুকুমার সেন,

৩৫. দিজেন্দ্ররচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

৩৬. রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, কলকাতা ১৩৬৯, নীহাররঞ্জন রায়

৩৭. বাঙলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, অরুণকুমার বসু

৩৮. 'সঙ্গীতপ্রসঙ্গ', রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা